॥ প্রাইজ ও লাইব্রেরীর উপযোগী অভিনব গ্রন্থ ॥

ইন্দিরাদি'র মিষ্টি গল্প

[অভিনব ও মিষ্টি গল্পে সম্পূর্ণ]

॥ ইন্দিরা দেবী ॥

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

—এই লেখিকার—

॥ অনবদ্য কিশোর গ্রন্থ ॥

ইন্দিরাদি'র আরো গল্প

পুতুলরা কথা বললো

রূপকথার দেশে

প্রথম প্রকাশ :

প্রকাশক :
পি, দে
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯।

মুদ্রাকর :
নারায়ণী প্রেস
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯।

পুস্তক বাঁধাই :
সিটি বাইণ্ডার্স
৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯।

প্রচ্ছদপট :
মানিক সরকার

ববি বনি
আর
মোম'কে

মেম

কলকাতা
১৯৬১

যা বলার—

ছোট্ট বেলায় গল্প শোনার তাগিদ থাকে সকলেরই। আমরাও ছোটবেলায় ঠাকুমা দিদাকে 'গল্প বলো' বলে বাহানা করতাম। ঘুমের ভারে চোখ যখন খাবারের থালায় মাথা ঠুকতো অমনি দিদা বলতেন: 'তারপর সেই রূপোর গাছে সোনার ফল'—চোখের ঘুম হাওয়া হয়ে যেত। খাবারের গ্রাস মুখের ভিতর অনায়াসে চলে যেতে থাকতো আর সামনের দেওয়ালে গল্পের ছবিগুলো ফুটে উঠতো। যেন সব দেখতে পেতাম।

আজ যখন ছোটদের দল বলে 'ইন্দিরাদি গল্প বলো, গল্প বলো।' তখন মনে হয় সেই দেওয়ালে ছবি ফুটে ওঠা আর কানে বাজে 'রূপোর গাছে সোনার ফল' এর কথা।

বুঝতে চেষ্টা করি ছোটরা কি চায়। সব রকমের গল্পকে সাজিয়েই 'মিষ্টি গল্প' তাদের জন্য আনলাম। ওরা খুশী হলেই সব সার্থক হবে।



বড় বিদ্যা

ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি চুরিকরা মস্ত অপরাধ পাপও বটে। যদি ছোটবেলায় কেউ কখনও ছোট চুরি যেমন পেনসিল, কলম, ব্লটিং, খাতা এসব সহপাঠীদের কাছে না বলে নিয়ে থাকে—মা-বাবা জানতে পারলেই বারণ করবেন, করা উচিত। দ্বিতীয় ভাগে পড়া সেই গল্প মনে হয়—মাসীর আঁদরে মানুষ হয়ে গোপাল চুরি করা শিখলো, মাসী কোনো-দিন বারণ করলো না। শেষে এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল—পরে একটু বড় চুরিতে তার জেলে যেতে হলো। বিচারের সময় মাসীও উপস্থিত ছিলেন সে মাসীকে ডেকে বললে চুপি চুপি কথা আছে কাছে এসো। মাসী কাছে গেলে তার কানে এমন কামড় দিল যে মাসী চীৎকার করে উঠলেন। তখন গোপাল বললে—যখন চুরি করতে শিখেছিলাম এটা যে অন্যায় কাজ তা বলনি বা এক-দিনও বারণ করনি। আজ তোমার জন্য আমার এই শাস্তি। এ অংশ তোমায়ও নিতে হবে···।

সত্যি কথাই চুরিকরা পাপ—মহাপাপ।

ছোটবেলায় দিদাকে বলতে শুনেছি চুরি করা পাপ অন্যায় সবই ঠিক—কিন্তু—

'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা'। এই বড় বিদ্যের গল্প বলি শোন—হ্যাঁ ঘটনা সত্যি ভাবতে পারো ইচ্ছা করলে।

হীরকরা শহরতলীর নতুন বাড়ীতে এসেছে। নতুন বাড়ীতে আসার আনন্দ অনেক আবার তা যদি নিজেদের বাড়ী হয়। তাই কয়েকদিন তাদের খুব আমোদ-আহ্লাদে কাটলো। তারপর আবার রুটীন মাফিক কাজ। কিন্তু বাড়ীটা সুন্দর হলে কি হয়—একটু অসাবধান হলেই ছোটখাট চুরি হতেই থাকে। ঘটিটা, বাটিটা, ছাদে ঝোলান শাড়ী, ধুতি বা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সামনে যা পাওয়া যায় তা অনায়াসে উধাও হতে লাগলো। হীরকের মা প্রথম প্রথম নতুন রাখা বাসনমাজা ঝিকেই দোষী সাব্যস্ত করে চারটে ঝি বদল করলেন। কিন্তু অনেক সাবধান হওয়া সত্ত্বেও এই ছিঁচকে চুরি এড়ানো যাচ্ছিল না। একটু অসাবধান হলে দরজাটা জানলাটা একটু খোলা পেলেই টুকটাক জিনিস উধাও হতে থাকে। কি যে বিপদ।

হীরকের ঠাকুমা চোর ধরতে উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করেন ততই বিফল হন—তাতে রাগ বেড়ে যায়। 'চোখের উপর দিয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে আর ধরতে পারা যাচ্ছে না—এরা কি মন্তর-টন্তর জানে? এই কথাই তাঁর মুখে শোনা যায়।

কিন্তু এত প্রয়াস সত্ত্বেও একদিন ভোরবেলা, তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি, ভোরে ওঠা অভ্যাস—তারই

জন্য ঘুম ভেঙ্গে গেছে। খাটের উপর বালিশের পাশে রাখা থাকতো একটি সুন্দর ঘড়ি, তার মূল্য যতই হোক না কেন তাঁর কাছে সেটা ছিল অমূল্য—কোনো প্রিয়জনের উপহার। একটি ব্যাগে বেশ কিছু টাকা, সকালে উঠেই গায়ে দিয়ে বাইরে আসতে হবে তাই একখানি শাল। আর টুকিটাকি সব হাতের কাছে রাখতেন। বইপড়া খুব অভ্যাস ছিল কখনও কখনও পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়তেন—আলো জ্বলতেই থাকতো।

সেদিন ভোরে ঠাকুমার কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগলো ও বৌমা, তোমরা আর কত ঘুমুবে বাছা, বেলা হয়ে গেল, চোরে সর্বস্ব নিয়ে পালালো আর তোমরা ঘুমুচ্ছ ?

হীরকের মা নেমে এলেন, কিছুক্ষণ পরে বাবাও এলেন, তারপর ছোটরাও গুট-গুট করে নামলো। সকালবেলাই ঠাকুমা এমন ফায়ার কেন ? ব্যাপারটা কি ? ঝি, চাকর প্রবলেম—যা হামেশাই সব বাড়ীতে ? হীরকের মা ভাবলেন —নিশ্চয় এখন কাড়ি বাসন নিয়ে কলতলা সার করতে হবে, আর শাশুড়ী ঠাকরুণ যা রেগেছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা সমস্যা দেখা গেল তা ঝি-চাকর কলতলা কিচ্ছু না—তবে ?

ঠাকুমার সব চুরি হয়ে গেছে। কাল রাতে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন আলো জ্বলছিল। কখন যেন হাল্কা ঘুমে শীত অনুভব করেছেন—উঠে দেখেন যে খাটে তিনি শুয়ে আছেন তার থেকে হাত তিনেক দূরে জানালা, সেটা আধ খোলা—এবং সেখান দিয়েই ঠাণ্ডা আসছে। শোবার সময় এই জানলাটাই তিনি ভাল করে বন্ধ করেছিলেন, অথচ আধ খোলা হলো কেমন করে ? বাচ্চা চাকরটারই কাজ

এটা—ভেবে তিনি জানলা বন্ধ করতে খাট থেকে নামতে গিয়ে দেখেন মাথার কাছে রাখা একটি জিনিসও নেই। শাল, টাকার ব্যাগ, ঘড়ি ইত্যাদি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনোটা পেলেন না তখন আবার জানলার দিকে তাকালেন—আধ-খোলা জানলা দিয়ে একটা লম্বা মত কি দেখা যাচ্ছে—ভাল করে দেখলেন—একটা লম্বা লগি, যেটা জানলা দিয়ে বাড়িয়ে একটি একটি করে তুলে নিয়েছে—অবশ্যই চোরেরা। তারপরই ডাকাডাকি, হাঁকাহাকি—বাড়ী শুদ্ধ লোক উঠে পড়লো—শেষ পর্যন্ত বৌমারও হাঁক-ডাক শুনতে হলো।

সকলে অবাক! এতবুদ্ধিও ধরে তারা? ঠাকুমা যতই চোর ধরবেন ভাবেন, চোরেরা ততই জব্দ করে।

সারাদিন সারা মাস ধরে এই শোক প্রবাহ চললো, ক্ষতি তো হলোই, আফশোষের সীমা রইল না আবার চোরেরাই তাকে বোকা বানিয়ে দিল?

মনের দুঃখ আর চোখের জলও একদিন থেমে থিতিয়ে এলো, তবুও সাবধানেই চলেছেন—কিন্তু চোর ধরার উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগলো। মাঝে মাঝে ছেলের নাম করে খেদোক্তি শোনা যেতে লাগলো 'এত সখ করে কি জায়গায় না বাড়ী করলো শেষ পর্যন্ত!'

কিন্তু স্থানেরও দোষ নেই, বাড়ীর তো নেই-ই। ভাগ্যের দোষই বলো আর বড়বিদ্যের হাত সাফাই বলো। চোরেদেরস্কুলে কত রকমের চুরিইনাআছে তারশিক্ষাদীক্ষাও অনেক কসরৎ করে দিতে হয়, তালিম নিতে হয়।

ঠাকুমার দুঃখ জুড়িয়ে আসার আগেই আবার এক ঘটনা। বাড়ী ভাল করে বন্ধ করে বহুকালের পুরোনো চাকর

ভরতকে রেখে সকলে একদিনের জন্য হীরকের বড়জেঠুর বাড়ী বেড়াতে গেলেন। ঠাকুমার উৎসাহ বেশী বড় ছেলেকে অনেকদিন দেখেননি, তাঁরও নতুন বাড়ী, সকলকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তাই সেদিন ছুটির দিন হৈ-চৈ করে সব কল্যাণীতে যাওয়া হলো। এক রাত্তির ভরত রাত জেগে বাড়ী পাহারা দেবে। ভরত জোর গলায় বললে, সারাদিন ঘুমিয়ে, সব দরজা বন্ধ করে সারারাত জেগে থাকবো – কিছু ভয় নেই। বরং রঘুনাথকে আসতে বলবো দুজনে থাকবো।

কিন্তু ভয়ের ঘটনাই ঘটলো শেষ পর্যন্ত। রাত যখন গভীর, কিসের শব্দ পেয়ে রঘুনাথ বললে ঃ এই ভরত কে যেন জিনিসপত্র নাড়ছে।

—ও বেড়াল ! ভরত পাশ ফিরে আবার চোখ বুজলো। কিন্তু রঘুনাথের চোখে ঘুম নেই আবার ভরতকে টেনে তুললো। তারপর এসে যা দেখলো চক্ষুস্থির। তিনজন লোক নীচের ঘরে যে বাসন ও জিনিসপত্র ছিল সব টেনে বার করেছে, মস্ত দুটো পোঁটলা মাথায় করে বেরিয়ে যাচ্ছে আর একজন জিনিস-পত্রের বোঝা তুলছে। হৈ-হৈ করে রঘুনাথ আর ভরত তাকে পাকড়াও করলে। চেঁচামেচিতে আরো লোকজন জড় হয়ে গেল—চোর বাবাজী আর পালাতে পারলো না।

পুলিশ এলো, সকলকেই থানায় হাজির হতে হলো। খুব বুদ্ধি ধরে চোর বাবাজী। তা না হলে এই বড়বিদ্যে শিখবে কি করে? এতক্ষণে মনে মনে সে ভরতকে জব্দ করার কৌশলটি ভেবে নিয়েছে।

বিচারের সময় যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কেন সে চুরি করতে এসেছিল।

অম্লান বদনে চোর উত্তর দিল—আমি তো প্রায়ই এ

বাড়ীতে আসি—এই ভরত আমার দরজা খুলে দেয়, জিনিসপত্র এগিয়ে দেয়, বার করে রাখে। দুজনের বখরা থাকে। তারপর ভালো করে ভরতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললে : কেমন, আর ধরিয়ে দেবে ?

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভরতের বাবা, ভরত সারা-জীবন এই বাড়ীতে কাটিয়েছে, কাজেই বাড়ীর সকলে বিশ্বাস না করলেও আদালত শুনবে কেন ?

চোরের শাস্তি যা হয় হলো। কিন্তু হীরকের বাবার অর্থ-দণ্ড বড় কম হলো না। জিনিসপত্রের হিসাব করে দেখা গেল—হাজার দুই টাকা—এবং মামলা সংক্রান্ত ব্যাপার ভরতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা পর্যন্ত সব খরচে হাজার খানেক – এই তিন হাজার চলে গেল। ভরতকে নিয়ে বাড়ী ঢুকেই শুনলেন হীরকের ঠাকুমা সখেদে বলছেন : কি জায়গায় বাড়ী করেছিলে বাবা—এসে পর্যন্ত....মাকে থামিয়ে হীরকের বাবা বললেন, জায়গাও ভালো, বাড়ীও মনের মত করা হয়েছে, চোরের উৎপাত সব জায়গায়, তুমি আর ওদের ধরতে যেও না, আমি চারিদিকে গ্রীল লাগিয়ে দিচ্ছি।

চুরি করা পাপ, অন্যায় সবই সত্যি—কিন্তু এই চালাক চোরটির সত্যিই বড়বিদ্যা জানাছিল যে ভরতকে পর্যন্ত ফাঁসিয়ে-ছিল 'চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খায়' কথা আছে, ভরত সেই কথা মনে করে দেশে চলে যাচ্ছিল।

ঠাকুমাই থামালেন : তাও কি হয় ভরত, কতকাল থেকে তোমরা আছ। ওসব হবে না। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললেন, কাজটা অন্যায় জেনেও তবু লোকগুলো চুরি করে মরে কেন, খেটে খেতে পারে না।

চুরি করা তো সত্যিই অন্যায়, মহা অপরাধ।

॥ ৬ ॥



প্রত্যেকবার পূজোর ছুটিতে নকুলমামা আমাদের বাড়ী আসতেন। পূজোর দিন ক'টা ছাড়াও যে কদিন তিনি থাকতেন কি রকম আনন্দের মধ্যে দিয়ে দিন কেটে যেতো। পূজোর ছুটিটা আরো বড় হলো না কেন তাই মনে হতো। নকুলমামা মার খুড়তুত ভাই, কিন্তু তখনকার দিনে এক সংসারে থাকলে খুড়তুত, জ্যাঠতুত বলে কিছু থাকতো না। দাদা, দিদি হিসেব হতো সব জড়িয়ে—তাই নকুলমামা আমাদের হিসেব মত ফুল মামা—কিন্তু ছোটবেলা থেকে শুনেছি নকুল মামা বলতেন 'দেখ বাপু ওসব ফুলটুল হতে পারবো না। সোজা নকুলমামা বলবি আমায়।' সাধারণ কথাও এত মজা করে বলতেন তিনি যে না হেসে থাকতে পারা যেতো না। মামার বাড়ী মাসীর সংখ্যা কম ছিল, মোটে তিন বোন। মা ছাড়া আর দুজনের অনেক দূরে বিয়ে হয়েছিল—এক মাসী থাকতেন দেরাদুন, একজন

শ্রীনগর। ছুটোই এত ভালো জায়গা, কিন্তু নকুলমামা সেখানে যেতেন না। বলতেন পূজোর ক'দিন ছুটির সঙ্গে আমি আরো ছুটি নিই কেন জানো ছোটদি, একেবারে বাঙ্গালী হয়ে থাকবো, হাত দিয়ে ডাল ভাত মেখে শাক শুকতো, মোচার ঘণ্ট, বড়ির তরকারী দিয়ে ভাত খাবো। ফোড়নের গন্ধওয়ালা মাছের ঝোল বাটি ভরে খাবো, হিং দেওয়া কড়াইএর ডাল আর পোস্ত চচ্চড়ী খাবো সোজা কথায় বাংলাদেশের ভেতো বাঙ্গালী হবো। বড়দি, মেজদিরা সাহেব বনে গেছে। ছুটির দিন আমি সাহেবী হতে পারবো না।" মা হাসতেন বলতেন বেশ তো বাঙ্গালী হয়েই থাক ক'দিন।

মার কাছে গল্প শুনেছি তাঁদের ছোটবেলার বাড়ীর ধরণ-ধারণের। যৌথ পরিবার—মার বড় জ্যাঠাইমা অর্থাৎ আমাদের বড়দিদিমা ছিলেন গিন্নী। মা বলতেন, বড়মার মত সুগৃহিণী নাকি দেখা যায় না, আত্মীয়-স্বজন, বাড়ীর সবাই ঝি চাকর পর্যন্ত 'বড়মা' বলতে অজ্ঞান। প্রত্যেকের সুখ সুবিধায় যেমন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, যেমন সকলকে দেখতেন—তেমনি উনি যা বলতেন তাতে 'না' বলার ক্ষমতা স্বয়ং বড়দাদুর পর্যন্ত ছিল না। এ বাড়ীর সবাই যেন 'সকলের তরে সকলে আমরা।'

নকুলমামা এলে আমাদের ভাইবোনদের আনন্দের সীমা থাকতো না। নকুলমামা বিয়ে করেননি ছেলেপুলেও নেই। কাজের জায়গায় থাকেন—মজা করে করে মাকে চিঠি লেখেন। মাকে এত ভালবাসেন যে খবরটবর পেতে একটু দেরী হলে মা কি রকম ভাবতেন। বাবা বলতেন, 'হ্যাঁরে তোদের মা'র মুখ ভার কেন, আদরের সম্বন্ধীর খবর এসেছে তো?' আসলে বাবাও যে খুব ভালবাসতেন।

এবার পূজোর দিন গুণে গুণে যখন এসে পড়লো—এদিকে নকুলমামাও হৈ চৈ করে এসে পড়লেন বিরাট ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে—'ছোটদি কোথায় গেলে? লাল্টু, ভুল্টু, টুলু কইরে তোদের দেখা পাচ্ছিনা কেন? নকুলমামার গলার আওয়াজ পেয়ে সবাই ছুটে এলাম। অনেক কিছু জিনিষপত্র তার মাঝখানে নকুলমামা ট্যাক্সিকে ভাড়া মিটাচ্ছেন।

মা এসে হেসে বললেন! 'করেছিস কি নকুল, একবারে গন্ধমাদন?' আমরা হেসে বললাম 'মা তোমায় কি বললেন নকুলমামা?' —'তোদের মা যদি ভাইকে বকে তাহলে মার ঠাঁইটা কোথায় ভেবে নে, তোদের বাবার ল্যাজটাও দেখে নে।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা সব নকুলমামাকে ঘিরে বসেছি। আমরা তিন ভাই-বোন ছাড়াও পাশের বাড়ীর বন্ধুরা দু'জন—শান্তনু আর টিঙ্কু, ছোটকার ছেলে-মেয়ে—রেণু আর টুম্পা। নকুলমামা গল্প বলছেন: 'যে ঘরটায় আমি থাকি—তার বড় জানালা দিয়ে বাইরের সবটুকু শুয়ে দেখা যায়। অনেক রাতে ঘুম ভাঙ্গলে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে—'

—চুপ করলে কেন বল বল?

—নকুল মামা ঢোক গিলে বললেন: 'কি বলবো বলত? মানে ভুত।'

—ভুত! বল কি নকুলমামা, তারপর? সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

—ভূত মানে ভুত—তারা তাদের কাজ করে যায়, আমি দেখি।

—ভয় করে না?

—আগে একটু করতো—এখন করে না।

—ওরা হাত পা ওয়ালা মানুষের মত ?

টুম্পা আর রেণুর মুখ শুকিয়ে গেছে। ওদের ঘরের মাথার দিকে যে জানালা সেটা ঠিক নকুল মামার গল্পের জানালার মত—আর ওদিকটা লোকজন কম চলে অনেক গাছ আছে। অন্ধকারে—গাছগুলো দেখলে ভয়ে গা শির শির করে। আবার ভূতের গল্প ?

শান্তু আর টিঙ্কু বললে : থাকগে মামা, অন্য গল্প বলো। ভয় করছে।

—কেন ? কেন ? ভয় কি ? ভূতের সঙ্গে সাহস করে কথা বললে একটুও ভয় থাকে না—সঙ্গে সঙ্গে এক টিপ নস্যি নাকে দিয়ে নকুলমামা বললেন : ভূত দেখবি ? কথাটা শুনে সকলের মুখ বন্ধ হয়ে গেল অর্থাৎ কিনা 'সভা হল নিস্তব্ধ।'

মা এসে ছিলেন চা দিতে—সকলের মুখ দেখে বললেন—কি ব্যাপার কি হয়েছে ?

নকুলমামা বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন : ভূত ! মা হেসে বললেন : তার মানে—তোর ভূত ? সত্যিই অদ্ভুত। ছেলেবেলায় নকুল আমাদের ভূত দেখিয়েছে। সে গুণ খুব আছে।

মা চলে গেলেন, আমি বললাম : সত্যি নকুলমামা তুমি ভূত দেখাতে পারো ?

তা পারি বৈকি !

—সে কি রকম ?

—ভূতের মত। আবার কি রকম !

ওদের মুখ শুকিয়ে গেলেও আমার মনে বেশ সাহস আছে—বল্লাম ; আমাদের দেখাবে ?

—তোরা তো ভীতু, তোরা কি দেখবি ?

—না আমার অত ভয় নেই, আমি দেখবো নিশ্চয়। টুলুও জোর দিয়ে বলে উঠলো ঃ আমিও, আমার একটুও ভয় নেই ওসবে।

টুলুর সঙ্গে সঙ্গে রেণু আর শান্তনুও বলে উঠলো। নকুলমামা বললেন ঃ বলিস কিরে তোদের একটুও ভয় নেই ? কিন্তু একসঙ্গে চারজন হবে কি করে ?

—কেন ? কেন ? হ্যাঁ হবেই।

অবশেষে ঠিক হলো তিনজনকে আলাদা দেখান হবে— আর একজন নকুলমামার সঙ্গে থাকবে। ভয় যদি না পায় সেও দেখতে পারে।

নকুলমামা উঠে গেলে আমাদের মিটিং বসলো।

তা হলে কি আজ রাতেই ?

টুম্পা বললো ঃ না আমরা আর একটু ভেবে নিই।

—অত ভয় কিসের ?

ভয়ের জন্যে বলছি না, শান্তনুরা তো এখানে থাকবে বাড়ীতে বলতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো আগামী কালই ভূত দেখা হবে। সকলের মনেই কি দারুণ উত্তেজনা, রাতে ঘুম হয় না। কেবল চোখ খুলে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বুক দুর দুর করে ওঠে। সকালে উঠেও সন্ধ্যের কথা মনে হয়। কোনো কাজেই মন বসে না। না জানি ভূত জিনিষটী কি রকম।

—তা হলে আজই দেখাচ্ছো তো নকুলমামা ?

—হ্যাঁ, কিন্তু ভয় পেলে কি করবো ? ছোটদি আমায় গাল মন্দ করবে যখন ?

—না না করবে না, ভয় পাবোই না। আমরা তো চারজন না তিনজন আছি ভয় কি ?

—বেশ !

যত বিকেল হয়ে আসছে আমাদের মনে ভয় মেশানো উত্তেজনা ততই বাড়ছে। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়—দেখলুম শান্তনুদের বাড়ী থেকে নকুলমামা বেরোচ্ছেন ওর ছোট কাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। তারপর সন্ধ্যার পর মার সঙ্গে বসে যখন কথা বলছেন—আমি গিয়ে বললাম: নকুলমামা, আজ কিন্তু শান্তনুরা আমাদের বাড়ী থাকবে।

—কেন ? ওহো মনে পড়েছে—ভুত।

মা বললেন আবার ভূত ?

—আচ্ছা তোরা যা নিশ্চয়ই আজ ভূত দেখবো। তারপর গলার স্বর নামিয়ে ছোট করে বললেন: ছোটদি ওগুলো তাহলে রেখো, আমি যাবার সময়······

—কি হে সম্বন্ধী আবার কি বলেছ ছেলেদের ভূতের কথা ?

বাবার সাড়া পেয়ে নকুল মামা হাসতে হাসতে উঠে গেলেন।

রাতে শান্তনু, টুম্পা, আমি আর টিঙ্কু জড় হলাম। সন্ধ্যার পর নকুল মামাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

মা বললেন বলে গেছে সিনেমা যাচ্ছে ঠিক সময়ে আসবে। তোমাদের খেয়ে দেয়ে শুতে বলেছে। রেণু মার কথা সমর্থন করে বললে: আমাকেও বলতে বলেছে তোদের।

তার দশটা বেজে গেছে, বাড়ীর সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। মা বললেন তোরা ঘুমুবি না ?

—নকুল মামা এসেছে মা ?

—আসবে, তার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে এলাম।

রাত তখন বোধ হয় বারোটা। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে. না নকুল মামা এলো না, কেবল ধাপ্পা দিয়ে গেল। বাইরেটা কি অন্ধকার। জানালা দিয়ে তাকালে কতকগুলো বড় গাছ চোখে পড়ে ঘেঁষাঘেষি হয়ে, শান্তনুদের বাড়ীটার ছায়া পড়েছে, একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

সকলেই ভাবছি আর তো চোখ চেয়ে থাকা যাচ্ছে না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে—ওমা, ওকি! শান্তনু বললে ঃ টিঙ্কু! ঢোক গিলে সে বললে দাদা! টুম্পা শক্ত করে আমার জামাটা ধরলো। সামনেই শান্তনুদের ছাদে সাদা কাপড় পরে কে দাঁড়িয়ে, লম্বা করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নাড়ছে —ডাকার ভঙ্গীতে, আর সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

তিন জনে জড়াজড়ি করে কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। দর দর করে ঘাম হচ্ছে। ওদিকে তাকাবার আর কারুর ভরসা নেই। হঠাৎ ঝড় ওঠার মত সাঁই সাঁই শব্দ হতে লাগলো, জানলা দিয়ে যেন কে ঢুকছে মনে হচ্ছে। অত হাওয়াতেও ঘাম ছাড়ে না। ভয় পেয়েছে সবাই অথচ আমি বড়, আমি যদি সাহস না করি—মনে ভেবে জোর করে তাকালাম। ওদের ছাতের দিকে তাকাবার আর সাহস হল না—ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকাতে গিয়ে মনে হল পাশে যেন কে দাঁড়িয়ে রয়েছে।—ঘাড় ঘোরাতেই ওরে বাবা, ওকি। লম্বা মত কে দাঁড়িয়ে। মুখে তার চিত্র বিচিত্র দাগ অন্ধকারেও ফুটে উঠেছে। দাঁতগুতো বার করে হাসছে কিন্তু মাঝে মাঝে দু একটা দাঁত নেই। আমি তাকাতেই ঘাড় নেড়ে জানতে চাইল—'কি'। পাশে আবার একটা লাল পাড় শাড়ী পরা বৌ। পুজোর জায়গায় কলা-বৌ এর

মত ঘোমটা দেওয়া। ডান হাতটা বার করে যেন উঠবার ইসারা করছে।

ওরে বাব্বা! চীৎকার করে উঠলো লালু—ব্যাস আর কিছু জানে না।

ভোর হয়ে আসছে—একে একে চোখ খুলছে সবাই—সেই সাংঘাতিক দৃশ্য আবার চোখে পড়বে নাকি! মা বললেন—কি হলো সব? ঠেঙ্গিয়ে ঘুম ভাঙানো যায় না। আর আজ ভোর হবার আগে সব পিট পিট করে তাকাচ্ছো কেন?

—জল দাও না মা? ভুলু বললে।

—নকুল মামা কোথায় মা?

মা বললেন: সকাল বেলাই জল কি হবে? উঠে যখন পড়েছ, যাও হাত মুখ ধোওগে, দুধ খাবার খাবে।

আমরা কেউ উঠতে পাচ্ছিলুম না, তখনও যেন ভয় জড়িয়ে আছে সারা শরীরে।

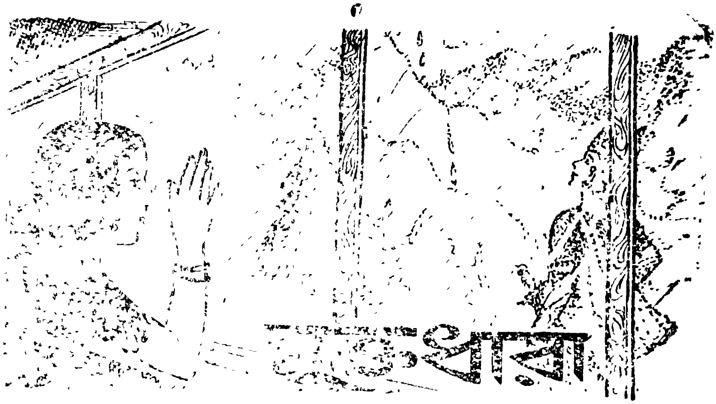
আর একটু বেলা হলো—সকলে উঠে পড়লাম। দুধ খাবার খেয়েও ভরসা করে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাচ্ছি না। একবার শান্তনুদের বাড়ী একবার খাটের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠছিলাম।

আরো বেলা হলো। নকুল মামা কই?

বাবা অফিসে বেরোচ্ছেন—বলছেন, কই গো সম্বন্ধী ঘুম ভেঙেছে?

মা বললেন—ঘুম ভাঙবে এখনি? সারারাত নৃত্য করেছে। আমার ড্রেসিং টেবিলটার অবস্থা দেখ, গোলা পাউডার আর সিন্দুরে। মেয়েটাও ঘুমুচ্ছে—কারুর ওঠার নাম নেই।

তাহলে? ভূত এলো কোথা থেকে? নকুল মামা তো ঘুমোচ্ছেন?



জানলার দুধ সাদা সার্সিতে নাকটা চেপ্টে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল পম্পি। ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে মাঠ, গাছপালা—আজকে শীতও বেশী। মা তো সব দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে বলে গেছেন আজ বাইরে যাবার কিম্বা খেলবার উপায় নেই, তাই পড়াশুনো করো!

'ধুর্ত্তোর পড়াশুনা'—পম্পি মনে মনে গর্জে ওঠে যেন। এমন বিকেলটা মাটি করে, একপা ঘর থেকে না বেরিয়ে শুধু পড়াশুনো? বয়ে গেছে।

জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। যদি বেরোবার কোনো উপায় থাকে। দিদুর কাছে থাকলেও আজ কেমন রাজপুত্রের গল্প শোনা যেতো।

বাইরে তখন কুয়াশায় ভরে গেছে—চোখের সামনে পেঁজা তুলোর মত যেন ঘুরছে। সার্সিটা যদি একটু ফাঁক হতো অমনি ঘর ভরে যেতো।

পম্পির মনে হলো বাবা চাকরী নিয়ে যখন এখানে এলেন এই ঠাণ্ডার দেশে। প্রথম দিন কুয়াশার দল বেঁধে আসা দেখে তার মনে হয়েছিল তাদের কোলকাতার বাড়ীতে প্রতিবেশীর দেওয়া ধোঁয়াতে যেমন আচ্ছন্ন করে দেয়— এও বোধহয় তেমনি। পম্পি বলেছিল 'দেখ মা কে উনুন ধরিয়েছে। আর ধোঁয়াগুলো এদিকেই আসছে।'

মা একটু হেসে বলেছিলেনঃ ধোঁয়া থেকে রেহাই পাওয়া গেছে, এ হলো কুয়াশা।

এই প্রথম কুয়াশা দেখলো, জোরে নিঃশ্বাস টানলো, আর বেশ লাগলো তো !

আর এখন তো অভ্যাস হয়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে পম্পি দেখলো বাইরে আর যেন কিছু দেখা যাচ্ছে না, পরিচিত রাস্তাটা, গাছগুলো সব যেন দুধ সাদা হয়ে একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু ঐ লোকটা কে দাঁড়িয়ে আছে ? সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। এইরকম চেহারা বেশ লাগে, মনে হয় ওর গায়ে বেশ জোর আছে। দুষ্টু লোকগুলোকে ও যেন এক হাতে মেরে ফেলতে পারে। খুব চকচকে, হাতেও অস্ত্রশস্ত্র, ঠিক এরকম কিন্তু চোখে দেখা অভ্যাস নেই। তবে যেন চেনা চেনা মনে হয়, দিদুর মুখের গল্পের সঙ্গে এর যেন সবটাই মিল আছে। কিন্তু ও কি দেখছে অবাক হয়ে ?

কি দেখছিল রাজপুত্র !

তার কাছে থেকে কিছু দূরে যে পর্বতশিখর—তার উপর থেকে একটি দু'টি টুপ টুপ করে কি পড়ছে ! মুক্তোর দানা !

কম থেকে ক্রমশঃ বেশী পড়তে লাগলো। আর সমতল

ভূমির যেখানটায় পড়ছে সেখানে জল জমে যাচ্ছে, ক্রমশঃ সেই জল নদীর আকার ধারণ করছে।

রাজপুত্রও একটা বড় গাছের তলে দাঁড়িয়ে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে।

রাজপুত্র অনেক যুদ্ধ করেছে, অনেক দেশ জয় করেছে, কত শত্রু নিধন করেছে। বড় বড় বীর যোদ্ধারা তার কাছে ঝড়ে উড়ে যাওয়া পাতার মত চলে গেছে, মারা গেছে। তার কাছে বিস্ময় বলে কিছু নেই, পরাজয় শব্দের সঙ্গে সে অপরিচিত।

এর উৎপত্তি স্থল কোথায়—তা লক্ষ্য করতে পর্বত-শিখরের দিকে অনেকবার দেখলো, কিছুই বুঝতে পারে না—এদিকে রাত নেমে এলো। লোকজন সঙ্গী সাথী কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একেবারে একা হয়ে গেছে, চারিদিকে গভীর অন্ধকার।

পায়ে পায়ে নদীর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলো—জলটা স্পর্শ করে দেখবে সত্যিই জল কিনা! মুক্তো থেকে জল হয়ে নদী সৃষ্টি হচ্ছে এমন তো কখনও শুনিনি। ভাবতে ভাবতে রাজপুত্র এগিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা ভারী কণ্ঠ কানে এলো : কোথায় যাচ্ছ, জল স্পর্শ করলেই মরবে, মানে মৃতপ্রায় হয়ে যাবে, খবরদার ছুঁয়ো না।

কে বললে কথাটা? চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো কেউ কোথাও নেই।

তাহলে আমি ভয় পেয়েছি—এই কথা ভেবে রাজপুত্র আবার এগিয়ে চললো।

—কথা শুনছো না তো? এখনি একটা পাথরের ঢিবি

হয়ে ঐ নদীর কাছে পড়ে থাকতে হবে। দেখছ কত ছোট বড় পাথর ?

—কে, কে তুমি কথা বলছো ? সাহস থাকে এগিয়ে এসো !' একথা বলে রাজপুত্র ঝকঝকে তীক্ষ্ণ তরোয়াল উঁচু করলো।

—ঐ তরোয়ালে আমাদের টুকরো করা যায় না, আমরা বছরের পর বছর কত শতাব্দী ধরে এখানে আছি, তোমার মত এখানে আরো কত এসেছে, কথা শোনেনি ঐ অবস্থা হয়েছে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি একজন বীরপুরুষ—তাই বারণ করছি, ছেলেমানুষী না করে কাজ করো—অন্যায় অত্যাচার ও অরাজকতার হাত থেকে সকলকে বাঁচাও।

—কিন্তু তুমি কে ? আর কথা বলছো কোথা থেকে ?

—সে পরিচয় পরে হবে। এখন শোনো, দেশ জনশূন্য হয়ে গেছে, শুধু দেশ কেন, আশে পাশে বহু দুর পর্যন্ত খাঁ খাঁ করছে। সুস্থ সুন্দর করে গড়ে তোলা—তুমি তো যোয়ান পুরুষ।

—নিশ্চয়ই ! দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো রাজপুত্র।

—তাহলে বলছি শোনো। হাতের তরোয়াল নামাও। পারবে উঠতে ঐ পর্বত শিখরে ? একদিনের কাজ নয়। যা দেখছ তার চেয়ে অনেক অ-নে-ক উপরে, ওখানে ওঠা সহজ কথা নয়। সময় লাগবে।

—তা হোক আমি পারবো। সময় ? আমার কাছে সময় অনেক কম লাগবে। বিপদকে আমি গ্রাহ্য করিনা। নিশ্চয় পারবো।

—না, অত সহজ নয়, অ-নে-ক দুর, অনেক সময় লাগবে,

তবে আমি তোমায় পথ বলে দেবো—যদি আমার কথা না শোনো, সোজা চলে যাও—খাড়াই পাহাড়ে উঠতে তো পারবেই না, আর মাঝখানেই তোমায় হয় বন্দী হতে হবে, না হলে মারা পড়তে হবে। কি শুনবে আমার কথা ?

—কিন্তু তুমি কে ? কাউকেই তো দেখছি না।

—দেখবে দেখবে, অনেককেই দেখবে, তার আগে তো অনেক কাজ আছে তা তোমায় করতে হবে।

—আচ্ছা তাহলে বলো আমি কি করে কোন পথ দিয়ে যাবো ?

—রাত আরো গভীর হোক, এই গাছতলায় বোসো, ক্ষিদে পায় যদি ঐ গাছেরই মিষ্টিফল খেও, অন্য কোনও গাছে হাত দিও না।

—আচ্ছা, তাই হবে।

অদেখা প্রাণীর সব কথা শুনে রাজপুত্র তিলক চলেছে। অত খাড়াই পাহাড়—কিন্তু তার কষ্ট হচ্ছে না কেন ? তাহলে আর সেই শুভাকাঙক্ষী প্রাণীর কথা শোনার দরকার ছিল কি ?

উঠতে উঠতে কত দৃশ্যই চোখে পড়ছে, কোনোটা ভয়ঙ্কর আবার কোনোটা মনোরম। অদেখা বন্ধু বলে দিয়েছে যা সেইমত সে করে চলেছে, কিন্তু ঠিকই বলেছে সে রাত গভীর হলেই কি ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হয় হুম হুম করে—সারা পর্বত কেঁপে ওঠে। কত আর্ত চীৎকার শোনা যায়—মৃদু কান্নাও যেন কানে আসে,—কি ব্যাপার ? কিছুই বোঝা যায় না।

রাজপুত্র তিলক ক্রমশঃ অস্থির হয়ে পড়ছে।

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে তিলক যেন দেখতে পেলো

মেঘের মধ্যে এক প্রাসাদ। আবার ভাল করে দেখলো—না, মেঘের মধ্যে নয়—মনে হচ্ছে মেঘের সঙ্গে ঠেকে যাচ্ছে।

—তাহলে ঠিক হয়েছে—এবার আমি যেতে পারবো। একথা ভেবে তিলক দ্রুত উঠতে লাগলো—কিন্তু সে যতই উঠছে, প্রাসাদের কাছে আসতে পারছে না, কত দূর ?

আরো ক'দিন কেটে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় তার মনে হলো এবার সে পথ পেয়েছে, দ্রুত উঠতে লাগলো। তখনও প্রায় এক ক্রোশের মত দূরত্ব, হঠাৎ যেন কার সঙ্গে ধাক্কা লাগলো। ওমা ! একজন মানুষ ! কিন্তু স্থির, জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে না, কেবল তার চোখ দু'টো চক চক করছে।

—কে তুমি ?

উত্তর নেই। দু'চার বার প্রশ্ন করে উত্তর না পাওয়াতে রাজপুত্র রেগে গিয়ে তরোয়ালের কোপ বসিয়ে দিল। পাথরের মূর্তির গায়ে লেগে তরোয়াল ফিরে এলো কিন্তু সামনে দেখল জীবন্ত একটি সুপুরুষ।

—তোমার আঘাতের অপেক্ষা করছিলাম। এই আঘাতে আমার পাথরের দেহ থেকে মুক্ত হলাম। কি জন্য তুমি এসেছ জানি, চলো আমি তোমায় সাহায্য করবো।

অবশেষে একদিন সেই সাতমহলা প্রবাল গাঁথা প্রাসাদে পৌঁছল তারা। অনেক লোকজন—কিন্তু কাছে এলে দেখা যায় নীরব নিথর সব।

বন্ধু বললেঃ আঘাত করো বেরিয়ে আসবে সব ! রাজপুত্র দেখে অনেক মানুষ হয়ে গেল। সবাই যেন

ঘুম থেকে উঠছে, বলছেঃ কে বাঁচালে আমাদের কে বাঁচালে ?

তারপর আলাপ পরিচয় আর বন্ধুত্বের পালা। তিলক শুনলো দৈত্যরাজ আসে রাত্রে সঙ্গে কত শিকার, তারা প্রায় সবই মানুষ। দেশ উজাড় হয়ে গেলো। যেগুলো দরকার মনে হয় সেগুলোর মাথা চিবিয়ে খায়, তাদের আর্তনাদ রাতের আঁধার ভরিয়ে তোলে, যাদের দরকার নেই—তাদের পাথর করে রাখে।

একটি মেয়ে আছে ঐ সবচেয়ে উপরের তলায়—সে কেবলই কাঁদে, তার চোখ দিয়ে মুক্তোর মত ফোঁটা ঝরছে, কেঁদে কেঁদে সেও অর্ধমৃত হয়ে আছে। তবে তাকে ভালবাসে দৈত্য। বলেঃ কোথাও যেতে পাবি না, এখানে থাক সুখে থাকবি। যদি পালাবার চেষ্টা করিস তাহলেই পাথর করে দেবো। আমি যখন ফিরে আসবো তখন সামনে এসে বসবি, আমি যখন চলে যাবো তখন ঐ ঘর থেকে এক পা বেরুবি না, তোর যা চাই সব হাতের কাছে পাবি।

সত্যিই সব পায়—কিন্তু ফিরে যাবার জন্য আকুল হয়ে সে কাঁদে আর কাঁদে। তার চোখের জল মুক্তা ধারায় পড়ে নদী হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি তাকে উদ্ধার করতে পারো—ঐ ময়ূরপংক্ষী করে চোখের জলের মুক্তা নদী বেয়ে চলে যেতে পারবে।

—আর তোমরা ? রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করে।

—আমরাও যাবো—তবে তার আগে ভীষণ রকম যুদ্ধ হবে। এসো আমরা সেইজন্যই তৈরী হয়ে নিই।

দৈত্য বধ সহজ কথা ? সারা পর্বত কেঁপে কেঁপে উঠতে

লাগলো। মনে হচ্ছে প্রলয় হয়ে যাবে। কি ভয়ঙ্কর শব্দ রাতের আঁধারের মধ্যে। একদিকে বিকটাকায় দৈত্য অন্য দিকে হাজার লোক। তবু কি পারে লড়তে? মনে হচ্ছে দৈত্যের পায়ের চাপে এখনি সব ধুলো হয়ে যাবে। কিন্তু কৌশলে তারা লড়তে লাগলো যেমনটি বলেছিল সেই অদেখা বন্ধু।

ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর ভীষণ আর্তনাদ করে দৈত্য পড়লো। ভুমিকম্পের মত কেঁপে উঠলো পর্বত। সবাই ভাবলো বুঝি একসঙ্গে পাহাড় নিয়ে পড়বে—কিন্তু না পর্বত টললো না, ভাঙ্গলো না।

মানুষের সমারোহ লেগেছে যেন। কি করে এমন হলো? কত দিন পরে তারা প্রাণ পেয়েছে, এবার দেশে ফিরতে পারবে। আনন্দ কোলাহলে ভরে উঠছে স্থানটা।

দুধ সাদা মখমলের বিছানায় শুয়ে দুধ সাদা রং দুধকুমারী। চুলের রাশি মাটিতে লুটোচ্ছে। বড় টানা চোখের কোণ দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে, একটি একটি মুক্তোর দানা।

এরপরই মুক্তির দূত এলো।

ময়ূরপঙ্খী ভাসলো মুক্তা নদীতে। লোক লস্কর হৈ চৈ আনন্দোচ্ছল ছবি।

উপরের তলায় বসে আছে দুধকুমারী আর রাজপুত্র তিলককুমার। আর সমস্ত ময়ূরপঙ্খী ভরে আছে মুক্তি পাওয়া বিভিন্ন দেশের রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র আর সদাগরপুত্রের দল।

দুধকুমারীর চোখের জল আর ঝরছে না। আশ্চর্য ময়ূরপঙ্খী মুক্তা নদীর যে পথটুকু অতিক্রম করছে অমনি তার

জল শুকিয়ে যাচ্ছে—পিছনে বালির রাশি চিকচিক করছে আর সামনে টলটলে জল।

অবশেষে পৌছে গেল ময়ূরপঙ্ক্ষী আর এক বিরাট রাজপ্রাসাদের সামনে।

—যুদ্ধটাই যা খারাপ—তা না হলে আর সব ভালো। কষ্ট না করলে তো অতগুলো লোককে তিলক মুক্তি দিতে পারতো না, দুষ্টু দৈত্যটা কতদিন আটকে রেখেছে ওদের।

কিন্তু দুধকুমারীর সুন্দর মুখটা যেন খুব চেনা ? হ্যাঁ ঐ যে স্কুলের সুতপার মত, ভারী সুন্দর কিন্তু- - - -।

নিজের মুখে বলে উঠলো পম্পি—ওহো, বলতে ভুলে গেছি—পম্পা ভট্টাচার্য— ক্লাস ফাইভ।



ঘটনাটা সত্যিই, তবে ব্যাপারটা বড্ড গম্ভীর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

তোমাদের কারুর মুদ্রাদোষ আছে নাকি? একটা কথা প্রত্যেক কথার শেষে বলা? আমার অমৃত জ্যাঠা কথায় কথায় বলতেন, 'তোমার গে'—সব কথায় সেই কথা—'তোমার গে' ওরে তোরা কেমন আছিস?' অমৃত জ্যাঠা আমাদের বাড়ী এলে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে চোখে চোখে কথা হয়ে যেত, ছোটখাটো একটা হইচই, ফিস-ফিসানি, চাপাহাসি। তাছাড়া অমৃত জ্যাঠা এত পান খেতেন আর এত অসাবধান ছিলেন যে, দু' কষ বেয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়তো, তাঁর হুঁস থাকত না। এত বিশ্রী দেখাতো যে, কত সময় আমরা নকল করেছি অমৃত জ্যাঠা সেজে।

এক মাসতুতো দাদার মুদ্রাদোষ ছিল 'ইতিমধ্যে' বলা। সব কথায় মানে হোক আর না হোক 'ইতিমধ্যে'টি ঠিক আছে।

আর ছিল পানুকাকার মুদ্রাদোষ—'ড্যাম ইট'। ছোট বেলা থেকেই সব কথায় 'ড্যাম ইট।' ঠাকুমাকে বলতে শুনছি ঃ কি এক কথা শিখেছিস পানু, কি কথার ছিরি তোর ? কিন্তু ঠাকুমা বললে কি হয়, ও অভ্যাস কি যাবার ? পানুকাকা মোচার ঘণ্ট খেতে ভালবাসেন—ঠাকুমা নিরামিষ ঘর থেকে নারকোল কোরা মাখা মোচার ঘণ্ট এনে পাতে দিলেন। কাকা খুসী হয়ে বলে উঠলেন, 'ড্যাম ইট'। ঠাকুমা ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, ঐ অভ্যাসটা কি তোর যাবে না পানু ?

তখন আমরা বেশ একটু বড় হয়েছি, ভাইবোনেরা আড়ালে-আবডালে একটু আলোচনা করি। কে কি রকম কথা বলে, কি করে হাঁ করে, মুখের ভিতর কতটা দেখা যায়, অতল গহ্বর যেন, কার কি মুদ্রাদোষ, খাবোনা-খাবোনা করে কে থালাসুদ্ধ খাবার সাবাড় করে, দত্ত বাড়ীর জ্যাঠাইমা কি রকম নথ নেড়ে কথা বলেন, কালীঘাটের মাসীমা কি রকম ভালোবাসেন—কেমন চেহারাটা ভালবাসায় মাখা, যখন আসেন কত খাবারদাবার আনেন, কত পুতুল খেলনা কালীঘাটের, দাদারা কি মজা করে—কিন্তু অত সুন্দর মাসীমা যখন কথা বলেন, কেবল বৌমার অখ্যাতি—এটা আমাদের ছোট মনে বড্ড রেখাপাত করতো।

পানুকাকার মুদ্রাদোষ প্রায় পুরোনো গা-সহা হয়ে এসেছে—তখন চলছে খোকনদা'র 'ইংলিশ'। সব কথায় বেশ বড় জিনিস বা পছন্দসই বস্তুকে বোঝাতে হলে বলতো 'ইংলিশ'। শেষে সব কথার মাঝেই ঐ কথা মুদ্রাদোষে দাঁড়ালো। এই সময় একদিন হঠাৎ ছোটদাদু, অর্থাৎ পানুকা'র বাবা মারা গেলেন। পানুকাকাই একমাত্র ছেলে। খবর শুনে কত লোক এলেন, এলেন দিল্লী থেকে ন' খুড়ীমা,

পানুকাকাকে প্রায় ছোট থেকে মানুষ করেছেন বললেই হয়—বললেন ঃ ওমা পেনো, মা কবে গেছেন, বাবাও গেলেন বৌ নাতির মুখ দেখলেন না !

এই রকম দুঃখের কথা কত লোক জানিয়ে গেল। এইসব কথা শুনে পানুকাকার চোখের কোণ চিকচিক করছিল বটে, কিন্তু মুখে সেই এক কথা 'ড্যাম ইট'।

পানুকাকার চেহারা আর মনের অবস্থা দেখে আমাদের খুব খারাপ লাগতো, কম্বলের আসন, এটা-ওটা এগিয়ে দিতে তৎপর থাকতাম। কেমন যেন চুপসে গেছেন পানুকাকা। অমন ফিটফাট বাবুলাট চেহারা যেন একেবারে অন্য রকম ! মাথার চুল শুকনো উড়ছে, আধময়লা পাতলা চাদরটায় গা-ঢাকা—যেন ভিখিরীর চেহারা। পানুকাকার জন্য আমাদের মনে দুঃখের যেন অন্ত নেই।

কিন্তু সেদিন শ্রাদ্ধের দিন। শ্রাদ্ধবাসরে কত কি সাজানো হয়েছে। খাট, বিছানা, ছাতা, জুতো, চাল, ডাল সবজী, বাসনপত্র—কিছু বাদ নেই। বাড়ীতে কত লোক গিসগিস করছে। লুচি ভাজার গন্ধ আসছে, কুমড়োর ছকা, কপির ডালনা, বেগুন ভাজা প্রভৃতি কত কি রান্নার সুবাস, আবার অন্যদিকে থরে থরে মিষ্টি খাবার। সেদিকে লোভ জাগলেও আমরা সেই শ্রাদ্ধের জায়গাটিতে বসে পূজা দেখছিলাম। পিণ্ডিগুলো নিয়ে মন্ত্র পড়ে নিবেদন করতে হয় সেইসব নাকি যাঁদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁরা এসে গ্রহণ করেন—সে সব চোখে আমরা দেখতে পাই না। পুরোহিত তিল মাখা ভাতের পিণ্ডি পানুকাকার হাতে তুলে দিলেন, দিয়ে মন্ত্র পড়াতে লাগলেন, মন্ত্র শেষ হলে চোখ বুঁজে তাঁকে মনে করে সামনে রাখা পাত্রে দিয়ে দিতে হবে শ্রদ্ধাভরে।

পানুকাকা মন্ত্র শেষে পিণ্ডদান করেই বলে উঠলেনঃ 'ড্যাম ইট'। আমরা যেন ছোটদাদুকে সামনে দেখার মত চমকে উঠলাম। পুরোহিতের মুখটা অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে গেল, কপাল কুঁচকে উঠলো, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বাবা কেবল আস্তে আস্তে বলে উঠলেনঃ ইস্, পানু যে কী করে! অমৃত জ্যাঠা গুনগুনিয়ে উঠলেনঃ ঠিক বলেছ, তোমার পে, এটা কি ঠিক হলো!

আমরা ছোটর দল আর সেখানে থাকতে পারলুম না, ছুটে চলে এলাম।

এই রকম মুদ্রাদোষ কত যে বিশ্রী পরিস্থিতি হয় তা আরো কয়েকবার দেখেছি। মুদ্রাদোষটা ত্যাগ করাই ভাল। দাদুর বন্ধু প্রমথদাদু কিছু কাজে মন দিলেই জিবটা বার করে বাঁ দিকে বাঁকিয়ে নিতেন—মাঝে মাঝে জোর দিয়ে ফেলে নিজেই আহা-উহু করতেন। আমরা কত সময় জিব ভেঙ্গাতে গিয়ে বকুনি খাবার ভয়ে সামলে নিয়ে বলেছি, 'প্রমথদাদু হয়েছি।'

তাই মুদ্রাদোষ ত্যাগ করাই ভাল, না হলে সন্তুর মতো অবস্থা হলে আর রক্ষে নেই! সব কথায় সনৎ বা সন্তু বলতো, 'সত্যি বলছি'। ক্লাসে এমন এমন ঘটনার পর 'সত্যি বলছি' বলতো যে, অর্থটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে যেতো। তাছাড়া সন্তুর নামকরণই হয়ে গিয়েছিল, 'সত্যি বলছি'। মাষ্টার-মশাইরা কতদিন কতবার বারণ করেছেন, সংশোধন করে নিতে বলেছেন, কিন্তু কি জানি কেন তা হয়নি। সন্তু কোন্ কথাটা কখন সত্যি বলছে মিথ্যে বলছে তা বুঝতে খুবই অসুবিধা হতো! কিন্তু তবু এই 'সত্যি বলছি' বলা তার গেল না।

তখন কিন্তু স্কুলে বেশ শাস্তি দেওয়া হতো। কান ধরে কোণে দাঁড়ান, বকুনি, চড়-চাপড় বা বেত খেতে হতো। ছোটখাট শাস্তি কত যে সন্তুকে ভোগ করতে হয়েছে তার হিসেব নেই!

হারাধন যেমন ছিল পড়াশুনোয় অমনোযোগী, তেমনি ছিল তার হাত-সাফাই। পেনসিল, কলম, খাতা এটা-ওটা, পয়সা কেমন করে যে নিয়ে নিতো আর ধরা যেতো না তাকে। অবশেষে একদিন ধরা পড়েছিল। আর সব দিন সে বেমালুম উতরে গিয়েছিল।

সেদিন শোভন স্কুলের মাহিনা এনেছে, টিফিনের পর গিয়ে জমা দিয়ে আসবে, কিন্তু দেখা গেল টাকা নেই। শোভনের পাশে বসতো সন্তু। অনেক খোঁজাখুজির পর যখন পাওয়া গেল না, তখন টিফিনের পরে ক্লাস-টীচারকে জানানো হলো এবং আবার একদফা খোঁজাখুজি চললো। শোভন নাকি একবার একটুখানি বেরিয়েছিল বাথরুমে, কিন্তু আর সবাই তো আছে। ক্লাস-টীচার নতুন, বিশেষ কাউকে চেনেন না, তাই প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করলেন। না, না, না সবাই সমস্বরে বলছে। টিফিন সেরে সন্তু যেই ক্লাসে ঢুকেছে—তিনি বললেনঃ সনৎ তুমি তো শোভনের পাশে বসেছিলে তুমি জানো নিশ্চয় ওর টাকা কি হয়েছে?

আগাগোড়া ঘটনাটা সন্তু জানতো না, সে বললেঃ টাকা, কিসের টাকা—সত্যি বলছি।—

তার 'সত্যি বলছি'টা এমনভাবে শোনালো—কোনো জিনিস নিয়ে অস্বীকার করলে যেমন হয় -তেমনি।

কঠিন কণ্ঠে মাষ্টারমশাই বললেনঃ কোথায় রেখেছ

দাও, এমন চোর ছেলে তুমি, কাল থেকে আর স্কুলে আসবে না। তোমরা দেখতো ওর বই খাতা সব।—

হারাধন আগে এগিয়ে এসে জ্যামিতির বক্সটা খুলেই বললো—এই যে স্যার, এর মধ্যে !

আসলে ওটা হারাধনের হাতেই ছিল। কিন্তু দশচক্রে ভগবান ভূত হয়ে পড়লো।

ক্লাসের সব ছেলেরা সন্তুকে জানে, সে কখনও এমন করবে না, কিন্তু মাষ্টারমশাই এত রেগে গেছেন যে তারা কিছু বলার সাহসই পাচ্ছে না।

অবশেষে সন্তুকে কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন তিনি অফিস-ঘরে। হারাধন পিছনে পিছনে চললো আর সব ছেলেরা হতবাক হয়ে বসে রইল, আর একটি মিথ্যে ঘটনায় সন্তুর পড়ার জন্য তাদের দুঃখের সীমা রইল না।

কিছুক্ষণ পরে হারাধন এসে বললেঃ খুব শাস্তি হচ্ছে—ওকে পুলিশে দেওয়া হবে। ও যে নিয়েছে তা স্বীকার করছে। হেড স্যার যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিয়েছিলে সত্যি বলো ! ও বললেঃ সত্যি বলছি।

সেদিন আর ক্লাসে সন্তু এলো না। ছুটির পর তাকে দেখাও গেলো না। শোভন, অসীম আর মলয় সন্ধ্যা বেলায় তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। গিয়ে দেখলো হেডমাষ্টার মশাই ও সন্তুর বাবা কথা বলছেন—

আমার ছেলে কখনও একাজ করতে পারে না। আপনি ক্লাসের অন্য ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন না কেন ?

—যথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে তবে বলছি—আপনি ছেলেকে

স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিন, তাছাড়া কেন ও কথা বলছেন— ও তো নিজেই বলছে সত্যি কথা।

শোভন আর স্থির থাকতে না পেরে সামনে গিয়ে বললে, আমায় ক্ষমা করবেন স্যার আমরা জানি সন্তু টাকা নেয়নি, যে বার করেছিল, অনেকক্ষণ আগেই তার হাতে টাকা আমরা দেখেছি। আর সন্তু কি স্বীকার করেছে চুরি করেছে বলে ?

—হ্যাঁ, ও তো আগেই বলছে 'সত্যি কথা' বলছে।

সন্তুকে ডাকা হলো, সে বললেঃ টাকা? সত্যি বলছি—

বাধা দিয়ে হেডমাষ্টার মশাই বললেনঃ সত্যি বলছো তো টাকা নিয়েছিলে ?

সন্তুর বাবা বললেনঃ সত্যিই বলছে ও যে টাকা নেয়নি —'সত্যি বলছি' বলা ওর অভ্যাস।

—তাহলে কে টাকা নিয়েছিল, জানো ?

—টাকা ? সত্যি বলছি, হারুর কাছে দেখেছি, সত্যি বলছি···।

—আর তোমায় সত্যি বলতে হবে না—ব'লে চেয়ার ছেড়ে উঠে নেমে পড়লেন হেডমাষ্টার মশাই।

শোভন রেগে গিয়ে বললেঃ 'সত্যি বলছি' যদি বলা না ছাড়তে পারিস—জেলে গিয়ে পচে মরগে যা !

———



ফুলটুসী

ফুটেফুটে মেয়েটা এসে পড়লো সংসারের মাঝে। মাসীর সঙ্গে দু'দিন বেড়াতে এসেছিল বিয়েবাড়িতে, কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ভাল মানুষটি, মামা। মাসী তো তার কেউ নয়—তাদের পাশে বড় বাড়িতে থাকে, ওরা বড়লোক শুধু মাসীর সঙ্গে আসবে বলেই বায়না। মা শত কাজের মানুষ, বকুনি দিয়ে বলেন—যাবো যাবো বলে বায়না ধরেছিস কেন? মাসী যাচ্ছেন ওঁর আত্মীয় বাড়ী বিয়েতে। তুই কোথায় যাবি? ওরকম বলতে নেই। ওঁরা বড় মানুষ···।

—বড় মানুষ তা হয়েছে কি। না, আমি যাবো—নাক টেনে মেয়ে বলে। বকুনি খেয়েও থামে না। অবশেষে মাসী জানতে পেরে বললেন: তা কাঁদছিস কেন? চল আমি নিয়ে যাবো তোকে—দাও না গো সরলা মেয়েটাকে···।

মাসী ওকে ভালবাসে। চোখের জল মুছে ফুলটুসি উঠে

দাঁড়ালো। মায়ের কাছ থেকে একটা সাবান-কাচা ফ্রক কাগজে মুড়ে নিয়ে মাসীর কাছে এলো। মাসী বললেনঃ ও, এসেছিস, আয়! জুতো নেই বুঝি? ওরে লতা, জামাও একটা দেখতো ওর মত।

ফুলটুসি বললোঃ এইতো আমার জামা আছে। আর জুতো আমি পরি না।

ধমকে উঠলেন মাসীঃ জুতো পরি না কি আবার কথা? আমার সঙ্গে গেলে পরতে হবেই। আর যা রাস্তার অবস্থা কত কি ছড়িয়ে আছে—ঠিক নেই। দে তো লতা, দেখে শুনে একটা পরিয়ে—।

ততক্ষণে লতাও বেছে বেছে একজোড়া পুরানো জুতো বার করে এনেছে, আর সেটা বেশ চমৎকারভাবে ওর পায়ে লেগে গেছে।

মাসী আবার বললেনঃ যা এইটুকু সাবান নে আর এই ছোট চিরুনীটা। চান করে চুল আঁচড়ে—পরিষ্কার হয়ে নে, আর এই প্ল্যাষ্টিকের ব্যাগটা নিয়ে সব গুছিয়ে রাখ—সঙ্গে নিবি।

পুরানো প্ল্যাষ্টিকের ব্যাগটায় টুকিটাকি পাওয়া জিনিসগুলো সব গুছিয়ে ফুলটুসি প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কখন মাসী তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা হবেন।

একেবারে স্বপ্নের রাজত্ব। এসব ফুলটুসি চিন্তাও করতে পারে না। বিশ্বসংসারে এত আছে? বিয়ে বাড়ীর সানাই-এর সঙ্গে আলোয় ফুলে রঙীন কাপড়ের সঙ্গে বাড়ীটা সেজে উঠেছে, যেন হাসছে। কত লোকজন আসছে, গাড়ী থেকে নামছে। দামী দামী অলঙ্কার পোষাকে সেজে ঢুকছে, হাসি কথায় উচ্ছল হয়ে পড়ছে, তারপর টেবিলে কলাপাতায়

সাজানো ভাল ভাল খাবার খেয়ে চলে যাচ্ছে। বাড়ীর লোকেদেরও সময় নেই। মাঝে মাঝে ফুলটুসির ভয় করছে, এখানে এসে মাসীর মেয়েরাও ওদের সঙ্গে মিশে ওকে ভুলে গেছে। সোফার উপর বসে গল্প করছে। বড়দের কাছ থেকে চেয়ে আনা তবক দেওয়া পান মুঠো মুঠো চিবোচ্ছে, বোতলের লাল সবুজ জলগুলো দেদার খাচ্ছে, ফেলছে, আর অকারণ সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কত ফুলের মালা ছিঁড়ছে, খেলছে, ফেলছে !

ফুলটুসি এক কোনে দাঁড়িয়ে দেখছে। মার কথা শুনে না এলেই হতো। এসব দেখে কেমন ভয় ভয় করে। লতাদি তো ওকে ভালবাসে। সেও যদি একটু কাছে ডেকে নিতো তাহলে ওর হয়তো এরকম হতো না। সে তো এত বড় উৎসব কখনও দেখেনি। আনন্দ উৎসবের এত ঝলমল রূপ আছে তার ছোট্ট জীবনে সে জানেই না।

ছোটবেলায় গ্রাম থেকে চলে এসেচে—সেকথা তার একটু একটু মনে পড়ে এখনও। সান বাঁধানো পুকুরটার সামনে তাদের খড়ের ছাউনি একতলা বাড়ী, বড় উঠোন। কতগুলো সারি সারি ঘর। চৌকী পাতা। মার আর কাকির ঘরে ঘেরা টোপ দেওয়া ট্রাঙ্ক আর কাঠের বাক্স। বড় চৌকিটায় মা আর তারা শুতো—ঠিক সামনেই একটা কাচ বাঁধানো ছবি। অনেক লোকজন, তার মধ্যে খুব সেজে একজন পুরুষ, একজন মার মত মেয়ে কিন্তু কি সুন্দর চেহারা ওরা সিংহাসনে বসে আছে। ঘুম ভেঙ্গেই মা সেই ছবির দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করতো। ঐ ছবিটা নাকি রামায়ণের গল্পের রামরাজা'র—পাশে বসে সীতা। এ গল্প সে অনেকবার শুনেছে। পাশের ছোট

৩

চৌকিটায় বাবা শুতো, কখন শোয়া কখন ওঠা সে কোনদিন দেখতে পায়নি। তাদের বাড়ীটার চারিদিকে গাছপালা। উঠোনের কোণে তুলসী মঞ্চ, ফুলের গাছ, লেবু গাছ, পেয়ারা গাছ—অজস্র গাছ আর দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা আম কাঁঠালের গাছগুলোও কত বড়। অশ্বত্থ বটের ছায়ার ভাইবোনেদের নিয়ে খেলা করার কথাও তার বেশ মনে হয়। বাবা কাকা নাকি ক্ষেতের কাজে চলে যায়। মা রান্নাঘরে রান্না করতো, কাকি যোগাড় করে দিতো। মায়ের রান্নার ফোড়নের গন্ধ এখনও যেন মাঝে মাঝে নাকে আসে। কোনের ঘরটায় সাদাচুল ঠাকুমা কেবলই খাবার চাইতো। ঝকঝকে মাজা কাঁসিতে করে মা ভাত তরকারী গুছিয়ে নিয়ে যত্ন করে খাইয়ে আসতো আর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেই ঠাকুমা বলতে শুরু করতো তোরা আজ আমায় খেতে দিবিনি? মা চুপ করে থাকতো, কাকি বলতো—এ ভীমরতি আর কতদিন যে থাকবে?

সবার খাওয়া হলে বাসনের বোঝা নিয়ে মা পুকুর ঘাটে যেতো, কাকির সঙ্গে। কত তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিতো বাসনগুলো, সোনার মত ঝকঝক করতো। বাবা, কাকা বাড়ী ফিরবার সময় ছোট বড় কত মাছ হাতে করে আসতো, বলতো ঃ বাবুদের বিলে নেমেছিল কত মাছ উঠেছে, বাবুদের দিয়ে এইগুলো এনেছে বাড়ীর জন্য। কাকি বঁটি পেতে কুটতে বসতো—তারা ভাইবোন ভিড় করে তাই দেখতো।

সন্ধ্যা হলে পিদীম আর লণ্ঠনের আলো জ্বললেই ফুলটুসির চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আসতো। মা বলতো ঃ ঘুমিয়ে পড়িসনি, ভাইবোনেদের নিয়ে একটু খেলা কর। ভাত

ফুটেছে। ওবেলার মাছঝাল আছে তাই দিয়ে আর দুধ গুড় দিয়ে খেয়ে তারপর ঘুমুবি।

আগুনের উপর বড় হাঁড়িতে টগবগ করে ফোটা ভাত দেখতে পেতো, তবু কোনো কোনো দিন দাওয়ায় পাতা মাদুরে শুয়ে পড়েছে আবার কতদিন চোখ টেনে জল দিয়ে দিয়ে জেগে থেকেছে। ছোট থালা করে মা ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত দিয়েছে সামনে ধরে। কী ভাল লাগতো খেতে। তারপর চৌকিতে উঠে কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়া।

গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘোরা, দীঘির জলে চান করা আর প্রায় হাঁটুর ওপর কাপড়পরা গ্রামের মানুষদের কত ভাল লাগতো তা ফুলটুসি বেশ মনে করতে পারে।

তারপর কি যে হলো তাদের—খাবার দিবি না বলতে বলতে ঠাকুমা একদিন চুপ হয়ে গেল, ঘরটা খালি হয়ে গেল। মা মুখ শুকিয়ে বাবাকে বলতোঃ চল বাচ্চাদের নিয়ে আমরা চলে যাই। এখানে না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

তারপর একদিন শহরের একপাশের—অনেক লোকের থাকা এক জায়গায় একটা ঘরে এসে আশ্রয় নিল। দশটা ঘরের লোকের জন্য একটা জলকল ও অন্যান্য ব্যবস্থা। ঘর থেকে বেরিয়ে এক পা ফেলবার উপায় নেই। একটু বাড়তি জায়গা নেই মাপ ছাড়া। ক'দিনেই প্রাণ হাঁফিয়ে উঠলো।

তারপর একদিন যখন ঘরে কিছুই রইল না, মা কাজে বেরোলো এই মাসীদের বাড়ী। মাসীদের উঠোনের এক পাশে ভাইবোন দু'জনকে নিয়ে ফুলটুসি বসে থাকতো। একটু খোলা আলো পেয়ে বেঁচে যেতো যেন তারা, তবুও

ভাইবোনেরা শান্ত লক্ষ্মী, দেখতেও সুন্দর—তাই সবাই ভালবাসে। মা যখন অনেক কাজ নিয়ে পেরে ওঠে না। তারপর বাড়ী গিয়ে রান্না চড়ালে খাওয়া হবে—একটু মাজা একটা কড়াই দিয়ে বলতো, এই জলের ধারে বসে আস্তে আস্তে এটা মেজে ফেলতো মা। এত বেলা হয়ে গেছে, এখন বাড়ী না গেলে তোরা খাবি কি ?

এমনি করে মাকে সাহায্য করতে করতে ছোট মেয়ে হলেও ফুলটুসি শিখে গিয়েছিল বাসন মাজতে। মাসী বলতেন ঃ কেন সরলা, কচি মেয়েটাকে ওসব দাও, আহা কি নরম আঙ্গুলগুলো, বড় কষ্ট হয়।

সরলা বলতো ঃ কি করি বল, পেরে উঠছি না।

বড় ভদ্র মেয়ে সরলা। গ্রামে থাকলেও বর্ধিষ্ণু ঘরেই এসে পড়েছিল। সুস্থ স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাত্রা ছিল। অকস্মাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। অভাবেই তাদের চলে আসতে হলো।

মাসী সব বুঝতেন। ছেলেমেয়েরা এত অভাবী অথচ কত সুন্দর। বাড়ীর ছোটরা কেউ কিছু খেলে ওরা উপস্থিত থাকলে হয় উঠে যায় নাহলে পিছন ফিরে হাতের কাজ করে। হ্যাংলাপনা নেই, চেয়ে খাওয়া নেই। লোভের প্রকাশ নেই। কোনো জিনিসে হাত দেওয়া নেই। মাসী প্রায় বলতেন। সরলার ছেলেমেয়েরা কি সুন্দর। ঐ জন্যই ওদের ভালবাসতো সকলে।

চোখ দু'টো ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। ঘরের এক কোণে সোফার পিছনটায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লো। কতক্ষণ এমন ছিল মনে করতে পারে না। পরিবেশনের বালতি হাতে লতাদি'র যেন কে হয়—বলছে ; ওমা,

তোমরা দেখনি, খুকুটা এখানে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যে। হাতের বালতি নামিয়ে রেখে ফুলটুসিকে দু'হাতে তুলে নিয়ে একেবারে খাবারের টেবিলের সামনে বসিয়ে দিয়ে বললে : এই খুকু, খেয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়গে যা।

ঘুম ছুটে গেছে ফুলটুসির—চারিদিকে লোকজন। খাচ্ছে হাসছে কথা বলছে—পরিবেশনের লোকেদের নিয়ে কত মজার কথা বলছে—কেমন ভয় পেয়ে গেল সে। এদিক ওদিক কোথাও লতাদি বা মাসীদের কারুর চিহ্ন নেই।

—খা, আর মাছ নিবি ? মাংস ? বলেই সেই লোকটিই তার পাতে খানিকটা করে ঢেলে দিলেন। আবার বললেন : খেয়ে নে খুকু শীগগীর। তারপর ঘুমুগে যা।

ফুলটুসির নাকে খাবারের সুগন্ধ আসছে—কি করবে ভেবে না পেয়ে খেতে আরম্ভ করলো।

হাত ধুয়ে আবার কোথায় শোবে যখন ভাবছে—তখন লতা এসে বললে : কোথায় ছিলি ? খেয়েছিস ? ব্যস, আবার লতা অন্তর্ধান হলো।

দু'টো তিনটে দিন কোথা দিয়ে চলে গেল।

মাঝে মাঝে সবাই জিজ্ঞাসা করে : এই সুন্দর মেয়েটা কার রে ?

তারপর মাসী যেন ফিসফিসিয়ে কী বলে তাদের—আবার তারা তার দিকে তাকায়—এই চাহনিই ফুলটুসির খুব লজ্জার কারণ হয়।

উৎসব শেষে মাসীর সেজ বোন বললে : এই ফুলটুসি আমার বাড়ী যাবি ? আমি বাড়ী যাচ্ছি—চল। ঘাড় নেড়ে ফুলটুসি বললে : না, মায়ের কাছে যাব।

সেজমাসী বললে ঃ চল না বেড়িয়ে আসবি, মার কাছে পরে যাস—লতাও তো যাচ্ছে।

ফুলটুসিরও যাওয়া হলো—মোটে তো দু'দিনের জন্য। আবার ফিরে এলো তাদের সেই ঘরটিতে যখন তখন তার কেমন যেন লাগছে। অত বড় বাড়ী লোকজন সব কিছুর প্রাচুর্যের মধ্যে ক'দিনে যেন তার সব বদলে গেছে। আসবার সময় সেজমাসী বলেছিল ঃ মাকে বলে আমার কাছে এসে থাকিস, আমাকে জল দিবি, চুল আঁচড়ে দিবি পারবি না ? আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকবি স্কুল যাবি। মাঝে মাঝে মাকে দেখে আসবি।

হ্যাঁ না কিছুই বলেনি ফুলটুসি।

কিন্তু ফিরে এসে ওর কেবলি সেজমাসীর কথাগুলো মনে পড়ে। ইস্কুল যাওয়া ? ঐ তো দল বেঁধে বই নিয়ে, জলের বোতল পিঠে ঝুলিয়ে এক এক রংএর জামা পরে সব মেয়েরা যায় হাসতে হাসতে। আবার ফিরে এসে তারা যখন খেলাধূলা করে তখন তাদের ইস্কুলের কত গল্পই শোনা যায়। লেখাপড়া করা না কি খুব ভাল। কিন্তু তার ভাগ্যে কি হবে ? মা বেচারী একা কাজ পারে না। এখন সে বেশ শিখেছে। তবু মা কিছুটা হাল্কা হতে পারে। কিন্তু একটা বৃহত্তর জীবনের বীজ যেন উপ্ত হয়ে যায় মনে।

মাসীর বার বার বলায়—সরলা মেয়েকে সেজমাসীর কাছে পাঠালো। সেজমাসীও একদিন এসেছিলেন, বললেন ঃ ভালো লেগেছে তোমার মেয়েকে সরলা। দাও না আমার কাছে! আমার ফাই ফরমাস দেখবে—ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে থাকবে। পড়বে খেলবে তারপর আবার আসবে তোমার কাছে। আর মাঝে মাঝে তো আসবে।

মেয়ের শিক্ষাদীক্ষার কথা ভেবে সরলা রাজী হলো।

সেই থেকে সেজমাসীর বাড়ীতে খুব ভালই রইল ফুলটুসি —এখন সে 'ফুল্লরা রায়'। মাসীর মেয়ে যখন লেখে শর্মিলা রায় তা দেখে সেও শিখলো। মাসী হেসে বললেন বেশ হয়েছে। সকলেরই মনের মত হয়েছে ফুলটুসি— সকলে ভালবাসে। মাসী বললেন: তুই লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে ইস্কুলে চাকরী করবি—তাহলে মার আর কষ্ট হবে না। বাবা তো কিছু পারলো না। ভাল করে মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে নে।

ইস্কুলে যাচ্ছে। বাড়ীতে সে ভালই আছে কিন্তু কোথায় যেন তার সঙ্গে শর্মিলা ভাইবোনেদের একটু তফাৎ আছে সেটা মনে মনে বুঝতে পারে মাঝে মাঝে ফুলটুসি। নতুন কেউ বাড়ীতে এলে তার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে মাসী বলেন: ও আমার পুষ্যি। কিন্তু পরে চাপা কণ্ঠে কি যেন একটু বলাবলি হয়। ইস্কুলেও শুনেছে, ইতিহাসের দিদি বলছেন ফুল্লরা খুব মেধাবী। একবার বললে আর বলতে হয় না। তবুও খুব বেশী নাকি পড়বার সময় পায় না। অনেক কাজ করতে হয়।

—কেন? পড়াশুনো করে তো কাজ—মা কেন দেখে না?

—না ওতো শর্মিলা রায়দের বাড়ীতে থাকে—বলে মুখ ফিরিয়ে নিচু সুরে কি যেন বলেন দিদিরা।

কান দু'টো লাল হয়ে ওঠে ফুলটুসির। পড়াশুনো, খেলাধুলায়, আঁকা, সেলাই সব তাতেই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ঐ চাপা সুরের কথা শুনলেও আগে তার সহ্য হতো, এখন রাগ এসে যায়। কেন, কি করেছে সে?

পরিশ্রম দিয়ে সে ও-বাড়ীতে আছে, মাসীরা সবাই খুব ভালবাসে কিন্তু তাই বলে ঐ চাপা সুরে কি কথা? কোন পরিচয়? মাকে কাজ করতে হয় বলে? মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ আক্রোশে সে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে—তখন তার রাগ প্রকাশ পায়। 'বাড়ী চলে যাবো' ও শোনা যায় মাসী স্নেহের সুরে বলেন: ক্ষ্যাপামি করিসনি ফুলটুসি। যা, হাতের কাজ সেরে নিয়ে ইস্কুলের জন্য তৈরী হয়ে পড়।

কিন্তু ফুলটুসি যে কি রকম উপকারী সে আরো বোঝা যায়—বাড়ীতে ঠিকে-ঝি না এলে। ফুলটুসি বলে: কিছু ভেবো না মাসী। দেখো, আমি মেজে দিচ্ছি।

অবলীলাক্রমে ডাঁই বাসন অল্পক্ষণের মধ্যে সোনারমত ঝকঝকে করে তোলে। তারপর হাত পা ধুয়ে ইস্কুলে চলে যায়।

বাসনমাজা কাজটা যত সহজ তত সুন্দর করে করতে পারে, এর জন্য তার মনে কিছুই হয় না। তারপর আবার সেজেগুজে জলের বোতল ঝুলিয়ে ইস্কুলে যায় আসে। টুকিটাকি কাজ সারে।

বর্ষাবাদলে ঝি কামাই, বুঝবার জানাবার আগেই সেকাজ শেষ করে রাখে সে। মেসো একদিন বললেন: কি করো, তোমরা। শর্মিলার বয়সী একটি মেয়েকে দিয়ে পাহাড় পর্বত বাসন মাজাও?

মাসী বলেন: আমরা বলবার আগেই তো শেষ করে, কি করবো?

বিরক্ত মুখে চলে যেতে যেতে মেসো বললেন একটা বাচ্চা মেয়ে, পারো নাকি নিজের মেয়েকে এর আধখানা কাজও দিতে? কিন্তু বাসন মাজার কাজটাকে সে বেশ

বীরত্বব্যঞ্জক বলেই মনে করে। আত্মপ্রসাদ লাভ করে তার মত বাসনকে সোনার বর্ণ কেউ করতে পারে না—বিশেষ করে বাসন মাজার মোক্ষদা পর্যন্ত নয়।

অষ্টম শ্রেণীতে উঠে পড়লো ফুলটুসি যেন লাফ দিয়ে। এমনি করেই চলছিল—বেশ বড় হয়ে পড়েছে। সুন্দর মেয়ে আরো সুন্দরী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু তার যাবার পরোয়ানা এলো অন্যভাবে। এতদিন যেন সবাইকে ভুলেছিল সে, সুখ আর প্রাচুর্যের মধ্যে অর্দ্ধাহারে থাকা ভাইবোনেদের। মা'র শুকনো মুখ কিছুতেই মনকে নাড়া দিতে পারতো না। মা মাঝে মাঝে কিছু জিনিসপত্র দিয়ে ওকে দেখা করতে পাঠাতেন। তাকে দেখলে ভাইবোনেরা ভীড় করে এসে দাঁড়াতো। সেজেগুজে রিবন বাঁধা, ঝকঝকে জুতো পরা দিদিকে নিজের ভাবতেও যেন তাদের আড়ষ্ট লাগে। মা সব দেখে খুসী হয়ে ভাবে মেয়েটি সুখে আছে। যদি মানুষ হয়ে ওঠে! এদের তো দৈন্যের দশা।

মার মুখের দিকে চেয়ে একটু ভাবান্তর হয় ফুলটুসির, সে ক্ষণিকের জন্য। একটু পরেই ফিরে আসতে চায়। ময়লা জামা পরা ভাইবোনেরা বাস রাস্তা পর্যন্ত দিদির পিছু নেয়।

কিন্তু একদিন বিস্ফোরণ হলো।

শর্মিলার সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়তো ফুলটুসি। সেদিন যে পড়া দিতে পারলো না শর্মিলা, সে অনায়াসে তার উত্তর দিয়ে দিল। 'কি যে পড় তুমি শর্মিলা। কিছুই পারো না, কি কর, সিনেমা দেখ কেবল—না হিন্দি গানের তালিম নাও। ওর কাছে বসে এক সঙ্গে পড়া করলেও তো পারো? যেটা না পারবে সেটা ও বলে দেবে', অনিমাদি বললেন।

অসহিষ্ণু হয়ে শর্মিলা বললেঃ ওর কাছে? ওতো আমাদের বাড়ীতে থাকে—ও তো—

—থাকলেই বা তোমাদের বাড়ী, মানুষকে কোথাও না কোথাও থাকতে হবেই—তাতে পড়াশুনার সঙ্গে কি আছে।

বাড়ী ফিরে শর্মিলা চীৎকার করতে লাগলোঃ ওমা, তোমার সখের ঝি ফুলটুসি—

—শর্মিলা! রেগে উঠলেন মাসী—বলছি খবরদার-এই ধরণের কথা বলবে না।

ক্ষিপ্ত হয়ে শর্মিলা বললেঃ বলবো না কি একশো বার বলবো, ওর মা তো মাসীর বাড়ী বাসন মাজে, ওতো ঝি—

মেয়ের গালের উপর ঠাস করে চড় কষালেন মাসী—এইসব শিক্ষা দীক্ষা তোমার হয়েছে? কাল থেকে ইস্কুল বন্ধ, অভব্য, অসভ্য কোথাকার।

তখনকার মত থামলেও সারা বাড়ীর চেহারা যেন পালটে গেল। সন্ধ্যাবেলা টুকটুকি বললেঃ মা ফুলটুসিদি ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে বসে আছে—ও আজ সারাদিন খায়নি।

—ডাক ফুলটুসিকে।

ফুলটুসি এসে চুপ করে দাঁড়ালো।

—কি হয়েছে খাসনি কেন?

—মাসী! আমি বাড়ী যাবো! মার জন্যে মন কেমন করছে।

—সে কি রে? ইস্কুলে এত ভাল হয়েছিস—এখন কি যায়, পরীক্ষা দিয়ে যাস।

—না মাসী, মন কেমন করছে।

ফুলটুসি জেদ করে চলে গেলো। মাসী অনেক জিনিস দিচ্ছিলেন—কিচ্ছু নিলো না সে। কেবল নিজের কাপড়

চোপড় বইখাতা নিয়ে চলে গেল। মাসী বললেন: ক'দিন থেকে আবার আসিস ফুলটুসি।

একটু হাসলো সে।

ভাইবোনেরা ছুটে এলো 'দিদি এসেছে।'

মা বললে: এমন অসময়ে?

—তোমাকে ছুটি দিতে এলাম মা। আমি বড় হয়েছি এখন সব কাজ আমি করবো, তুমি ঘরে বসে রান্না করবে।

অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালো মা।

ছোট একটা স্কুলে ফুলটুসি কাজ পেয়েছে।

কিন্তু সকালে বিকেলে জলের ধারে বসে বাসন মাজতে মাজাতে ভাবে—এখনি তাকে তৈরী হতে হবে। ভাইবোনেরাও স্কুলে যাবে, স্কুল থেকে আসবে।

রক্তশূন্য মায়ের শুকনো মুখটা মনে পড়ে যায়—'মা তুমি ঘর থেকে বেরোবে না বলে দিচ্ছি।' তারপর কাজে চলে যায়—ফেলে আসা পিছন দিকের চিন্তাকে দূরে ঠেলে রাখে।

———



সভা, ফাংশন, মিটিং—কথাটা দৈনন্দিন জীবনে শুনে শুনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। প্রতিদিনই যেমন ফাংশন, তেমনি তার শেষে সমালোচনাও শুনতে পাওয়া যায়—অমুক ফাংশনে অমুক ঘটনা, কিংবা 'নৃত্যগীত অতি সুন্দর'—সকাল বেলা সংবাদ পত্র খোলার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে।

কিন্তু ফাংশন ও মিটিং-এর জয়যাত্রায় আমরা যতই অভ্যস্ত হই, আনন্দ পাই—সেদিনের ঘটনাটা কিন্তু অন্য রকম।

কি রকম ?

বলছি শোনো। এই শহরে সেদিন যা ঘটলো।

নেমন্তন্ন বাড়ী গিয়ে সুখাদ্য পরিবেশন না দেখে যদি দেখো, তখন উনুনে আগুন ধরাবার ব্যবস্থা হচ্ছে—কিংবা ছ'টার ফাংশনে গিয়ে যদি দেখো, সবেমাত্র চেয়ার নিয়ে ঠেলাগাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছে, আর অপেক্ষা করে যখন অব্যবস্থার চূড়ান্ত দেখে বাড়ী ফিরে যাবে কিনা ভাবছ, সেই সময় উৎসব শুরুর সূচনা ধ্বনিত হলো। মেজাজটা আগে থেকেই তিক্ত হয়ে যায় সন্দেহ নেই, আর বিশেষ ক্ষেত্রে

ছোট বয়সে নেমন্তন্ন বাড়ীর ঐ ব্যাপার দেখলে, রাগে-দুঃখে চোখে জল আনাও বিচিত্র নয়—তোমরা কি বল?

হ্যাঁ, সেদিন যা ঘটলো। ঐ ভোজবাড়ীর মতই অবস্থা।

ফাংশন। তিন দিনের উৎসব। সামনে ছোটরা, পিছনে বড়রা। আলিম্পল, চিত্র-বিচিত্র করে গেট সাজানো—সবই যেমন সর্বত্র হয় তার ত্রুটি নেই, বরং উৎসব-ক্ষেত্রের চাকচিক্য কারুকার্য আরো উজ্জ্বল।

আছে তো সবই—এখন সভাপতি এলেই হয়। সুরুর সময় ছিল ছ'টা, কিন্তু সাড়ে চারটার সময়ই সভাপতির বাড়ী গিয়ে ডাকাডাকি সুরু হলো। সবে মাত্র বাড়ীতে ফিরেছেন তিনি—বললেন কি ব্যাপার? ছ'টার অনেক দেরি, এখনই কি?

না, না দেখুন—একটু আগেই চলুন—রাস্তার যা অবস্থা! শেষ পর্যন্ত সভাপতি গিয়ে পৌঁছলেন—সুসজ্জিত স্থানে, কিন্তু একটা মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছে না। একটা চাবি-বন্ধ ঘর খুলে তাঁকে বসিয়ে—লোকটিকে আর দেখা গেল না। সভাপতির অপেক্ষা আর শেষ হয় না! একটি ঘরে তিনি বসে তাঁর কাজের হিসাব করছেনঃ এখান থেকে বেরোবার কথা সাতটায়, বালিগঞ্জের মিটিং সাড়ে সাতটায়, সাড়ে আটটা থেকে ন'টায় কাজটুকু সেরেই পারিবারিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে—তারপর তাঁর বাড়ী ফেরার হিসাব—সুতরাং সবগুলি নিয়ম মাফিক করতে হবে।

কিন্তু বসে বসে অতিষ্ঠ হয়ে যখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন যাকে দেখতে পেলেন, সে তাঁকে আশ্বাস দিলে—এই সুরু হচ্ছে।

আরো কিছুক্ষণের পরে যখন সত্যই বেরিয়ে আসার জন্য ঘরের বাহিরে পা দিয়েছেন, তখন উদ্যোক্তাদের দেখা গেল এবং তাঁকে সভায় নিয়ে যাওয়া হলো।

বিরক্তিতে এবং অন্য এনগেজমেণ্টে-এর গুরুত্বের কথা এবং সময়ের হিসাব করে তিনি তখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন। সবিনয়ে বললেন, আমার কাজটুকু সেরে চলে যাই—কারণ সাতটায় বালিগঞ্জে পৌঁছবার কথা, আপনাদের আগেই বলেছিলাম।

সেটুকু অনুগ্রহ উদ্যোক্তারা করলেন এবং প্রায় ৮ টার সময় গাড়ীতে উঠে সভাপতি বললেন, আপনাদের উদ্যোগ-আয়োজন সবই ভাল হয়েছে—কিন্তু সময় ঠিক না রাখতে পারলে আমাদের কাজের অসুবিধা হয়, আপনাদের কি হয় না? পরের এনগজমেণ্ট রাখার আর সময় নেই। ঘটনা ঠিক এমন হবে জানলে এখানে এসে অপেক্ষা করার সময় অন্য কাজে লাগাতে পারতাম কিংবা আসতাম না…।

সভাপতির কথা তখনও শেষ হয়নি, এমন সময় কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—কি বললেন, আসতেন না? অনুষ্ঠানে আসবেন না? আপনার এখানকার পর কি ফাংশন আছে তা দেখবার আমাদের দরকার নেই, আপনি কোন সাহসে বলছেন আসতেন না…তারপর বিভিন্ন কণ্ঠে নানারূপে আস্ফালন বিদ্রূপ শুনে সভাপতি স্তব্ধ—তারপর হাতঘড়িতে সময় দেখতে চাইলেন যে, আর পরবর্তী মিটিং করার কোন সম্ভবনা আছে কিনা—

কিন্তু বজ্রপাতের মত শব্দে কানের কাছে ধ্বনিত হলো—রাখুন মশায় অন্য এনগেজমেণ্ট! বলছেন কিনা আসতেন না? আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়!....

—আচ্ছা ঠিক আছে, নমস্কার, চলি তা'হলে ?

—আরে মশাই চলবেন কোথায়?—বলেন কিনা আসতাম না। একটু-আধটু দেরি হয়েছে তো কি হয়েছে ? আজকাল চারদিকে কত হৈ-হাঙ্গামা—তার মধ্যে ফাংশন হয়েছে তাই কত না!—সভাপতি গতিক দেখে সবিনয়ে বললেন, আরো ত্নটো ত্নটো কাজ রয়ে গেছে, সেগুলোতে উপস্থিত না হতে পারলে !···

ইতিমধ্যে বেশ ভিড় হয়ে গেছে। ওদিকের ফাংশনের অবস্থা কি হচ্ছে তা দেখা ও জানার চেয়ে এদিকের জটলার আকর্ষণ বেশী—ফাংশন তো রোজই আছে, প্রায় সর্বত্রই আছে। সভাপতি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন আর ব্যকুল হয়ে উঠছেন। অবশেষে বললেন—আচ্ছা বেশ নমস্কার, এখন আসি তা'হলে ?

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বলে উঠলো—এখনই কি ! এরপর হলো ছোটদের ভিড়। সভাপতি বুঝতেও পারলেন না অপরাধ কি তাঁর।—

পারুন আর নাই পারুন সভ্যসমাজে বাস করে শিক্ষিত ভদ্রলোক উপরন্তু সভাপতির পদ নিয়ে সময় শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতার ঈষৎ ইঙ্গিত দিতে গিয়ে 'ঘেরাও' হলেন।

অনেক রাতে কার করুণারবশে জানা নেই সভাপতির পদ থেকে মক্তি পেলেন বটে, কিন্তু যানবাহন কিছুই পেলেন না।

সভাপতির পদে নমস্কার জানিয়ে, প্রায়-ভোর রাতে বাড়ীতে যখন থানা-হাসপাতালে খবর নেওয়া প্রায় শেষ—অবসন্ন দেহে বাড়ী ফিরে বললেন—জীবনে আর সভাপতিত্ব নয়—আর কিছু বলতে পীড়া বোধ করছিলেন হয়তো, কারণ আগামী সকালের সংবাদপত্রের কথাও মনে পড়ছিল।



মা-র কথা

জন্মদিনে পাওয়া উপহারের বড় ছবির বইটা কেমন করে জানি না খোয়া গেল। বেশ মনে পড়ে নীরু দেখতে নিয়েছিল। কিন্তু সে বললেঃ ফেরৎ দিয়ে গেছে। মৃদুল কিন্তু সে বই আর চোখেই দেখেনি। মনটা খারাপ হয়ে গেল বইটা না পেয়ে। মাও তো পাতি পাতি করে খুঁজলেন —কিন্তু নাঃ পাওয়া গেল না।

মা বললেনঃ তোমাদের তো বলি শোনো না কেন? বই আর কলম কাউকে দিতে নেই। আর সে যদি এ বিষয়ে যত্ন না নেয় তো মোটেই দিতে নেই। তাছাড়া উপহার জিনিসের মূল্যই আলাদা। যে জিনিস তোমাকে কেউ উপহার দিয়েছে তা খুব সামান্য হলেও তাকে যত্ন করে রাখতে হয়। আর কাউকে তা দিতে নেই, খুব দরকারেও নয়।

মৃদুল মুখ ভারী করে বলেঃ বই দেখতে চাইলে, পড়তে চাইলে কি বলবো দেবো না? উপহারের জিনিস হলেই বা বলা যায় নাকি?

হারিয়েছে। আবার মুখ ভার কেন? সত্যি যদি দুঃখিত হয়ে থাকো—ফিরে আসবে, আর এই ব্যাপারে তোমার শিক্ষা হবে—আর কখনও অযত্ন করবে না।'

মা তখনও বলছেন: জানো, আমারও এমনি হয়েছিল। আমার বাবা আমায় একবার খুব বড় সুন্দর কাজ করা ফুলদানি দিয়েছিলেন—সেটা হলো তিব্বতীয় কাজের—কি চমৎকার দেখতে। বাবা বলেছিলেন: 'এটা আমারও উপহার পাওয়া কিন্তু যিনি এনে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন জোড়া না থাকায় তোমায় দিচ্ছি। আমার এত পছন্দসই জিনিস সেটা ছিল—কিন্তু এসব জিনিস যত্ন করে রাখতে হয়—বাড়িতে কেউ করে না। তোমায় দিচ্ছি তুমি খুব যত্ন করে রেখো।'

আমারও খুব পছন্দ হয়েছিল—খুব ভাল করে যত্ন করে রাখতাম—নাইবা থাকলো জোড়া। কি হলো শোনো—তোমার বাবার একবার খুব অসুখ করলো, বাঁচবার কোনো আশা ছিল না, আমরা তো হাল ছেড়েই দিয়েছিলুম, দিনরাত শঙ্কায় কাটতো। তোমার ঠাকুমা ঠাকুর ঘরে বসে কেবল প্রার্থনা করতেন। অনেক দিন এই অবস্থায় চললো তারপর ডাক্তার প্রফুল্লবাবু ওঁকে অসাধারণ পরিশ্রম করে সারিয়ে তুললেন। উনি যেদিন প্রথম অন্নপথ্য করলেন—সেদিন বাড়িতে কি আনন্দ। ডাক্তারবাবু এসে বললেন, কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছে, সব সার্থক হয়েছে। তোমার বাবাকে বললেন: বেশ কিছুদিন খুব সাবধানে থাকবেন মশাই। আমি মাঝে মাঝে আসবো। চলে যাবার সময় হঠাৎ সিঁড়ির বাঁকে রাখা ফুলদানীটা দেখে বললেন: 'বাঃ কি চমৎকার এটা, সচরাচর দেখা যায় না। কোথায় পেয়েছেন? জোড়া নেই?'

তার কথার উত্তর দিলাম। কিন্তু তখন থেকেই মনে হচ্ছিল—বিশেষ উপহারের জিনিস হলেও আমি এটা ওঁকে দেবো, কারণ উনি যে কীভাবে তোমার বাবাকে বাঁচিয়েছেন। একদিন পাঠিয়েও দিলুম। খুব আনন্দ প্রকাশ করে গ্রহণ করেছেন জানালেন। এর প্রায় বছর তিন চার পরে তোমার বাবা গিয়েছিলেন পুরোনো জিনিসের দোকানে। ওঁর তো এসব শখ আছে। এই ধরনেরই ফুলদানী দেখে কিনে নিয়ে এলেন। আমায় বললেন : এই নাও তোমার ফুলদানী জোড়া হলো। একটা পুরোনো জিনিসের দোকানে পেলাম—বললে : জোড়া নেই বলে বিক্রি করে গেছে, এক ডাক্তারের কাছে পেয়েছে।

আমি অবাক হয়েছিলাম। অনেকদিন পরে তোমার বাবাকে বলেছিলাম সব কথা, আর উপহারের জিনিস অন্যকে দেওয়ার খুব অনিচ্ছা থাকায় শুধু কৃতজ্ঞতায় দিয়েছিলাম। উনিও খুব অবাক হলেন। কিন্তু ওটা কিছু মূল্যের বিনিময়ে ফেরৎ এলো ভেবে আমরা খুব খুশী হলাম।

মা'র কথাগুলো যেন গল্পের মত শোনালো মৃদুলের। এ আবার হয় নাকি ? আমি কি চাই আমার অমন সুন্দর বইটা হারিয়ে যাক—? আমি তো ফিরে পেতে চাই, কিন্তু ঠিক জানি, যে নিয়েছে সে আর দেবে না। নীরুটা ভীষণ পাজি। কি রকম অস্বীকার করছে…মনে মনে ভাবলো।

না, বইটা পাওয়া গেল না। সত্যিই, মার কথা মিথ্যে হয়ে গেলো। কিন্তু মৃদুলের কি যে মন খারাপ হয়ে গেছে। কারণে অকারণে সেই ঝকঝকে তকতকে মোটা ছবির বইটার কথা মনে হয়—আর ছবিগুলোর সঙ্গে দেশ বিদেশের

কত ইতিহাস লেখা আছে। বাবা প্রথম দেখেই বলেছিলেন এতো একটা সম্পত্তি, ভালো করে যত্ন ক'রে রেখো মৃদুল।

মৃদুল তো ভাল করেই রেখেছিল কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল যেন। নীরুর বাড়ি গিয়েও সে দেখতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু যতটুকু দেখা সম্ভব হয়েছে তাতে বিফল হয়েছে। হয়তো নীরু ফেরৎ দিয়েছিল—কিন্তু সেরকম মনে করতে পারে নি মৃদুল, তাই ভাবে, ভাবে আর ভাবে—বাবা যদি কোনোদিন দেখতে চান কি বলবে সে? ভাগ্য এখন বাবা খুব ব্যস্ত আছেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো। বই পাওয়া গেল না।

প্রায় ছয় মাস কেটে গেছে, মনের কষ্টেরও কিছুটা লাঘব হয়ে এসেছে, মাঝে মাঝে মনে হলেই খারাপ লাগে, তথ্যপূর্ণ অমন সুন্দর বইটা…!

এতদিন পরেও সেদিন বিকেলে এত মন খারাপ হলো মৃদুলের যে, স্কুল থেকে এসে আর খেলতেই গেল না। চুপ করে পড়ার টেবিলে বসে রইল। খুব খারাপ লাগছে তার—যে নিয়েছে সে তো সত্যি কথা বললেই পারতো! কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে কি হয়?

—মৃদুল! মৃদুল!! বাবার কণ্ঠস্বর না? মৃদুল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—সামনেই বাবা।

—কি খেলতে যাওনি? কেন? শরীর খারাপ নয়তো? মাথা চুলকে মৃদুল বললে: না—এমনি…।

—এই নাও কী চমৎকার একটা বই এনেছি তোমার জন্য। কোথায় যেন দেখেছিলাম—তখন থেকেই ভাবছিলাম তোমার জন্য একটা দরকার, পেলেই আনবো।

আজ আবার পুরোনো বইএর দোকানে গিয়েছিলাম- সামনেই পেলাম। কিন্তু একেবারে নূতন—নাও ধরো, খুব ভাল বই। যত্ন ক'রে রেখো।

এর মধ্যে মা এসেও দাঁড়িয়েছেন কাছে।

বইটা একেবারে এক—মনে মনে ভাবলো মৃদুল—তারপর বইটা খুলে প্রথম পাতাটিই নজরে পড়লো, যেখানে লেখা আছে—

পরম স্নেহের মৃদুলের জন্মদিনে—

অরুকাকা
৩০শে আষাঢ়
১৩৬৮

বিস্মৃত দৃষ্টিতে মৃদুল মায়ের হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে রইল ॥

—————



বনদেবী ও কাঠুরিয়া

সুদাম কাঠুরিয়ার বড্ড কষ্ট। রুজি রোজগার নেই। বনের ভেতর দিয়ে কাঠ কেটে এনে যা বিক্রী হয়, তাতে আর দিন গুজরাই হয় না। এই দুর্মূল্যের দিনে ঐ কটা পয়সায় কি-ই বা হয়। তারপর এইসব কাজে দৈহিক পরিশ্রম হয় কতো বেশি—সেই পরিমাণ খাওয়া-দাওয়াও চাই তো। কিন্তু তা আর হয় কৈ? দুঃখই সার হয়।

সুদামের বৌ লক্ষ্মী, নামেও লক্ষ্মী কাজেও তাই। তাদের মাটির ঘর, খড়ে-ছাওয়া চাল। কিন্তু কি পরিচ্ছন্ন; আঙ্গিনায় আলপনা দেওয়া : চারিদিকে ঝকঝকে তকতকে। বাড়ি-ঘর জিনিস-পত্র দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না সুদামদের প্রায় অর্দ্ধেক দিনই আহার জুটানোই মুশকিল হয়। ছেলেমেয়ে দেবু-দুর্গাও তেমনি ভালো।

প্রতিবেশীরা সকলেই ভালোবাসে ওদের, অভাব অভিযোগও বোঝে। কিন্তু বারোমাস কষ্ট হলে আর কে কতো দেখবে? কথায় বলে, নিত্যি রোগ দেখে কে, নিত্যি

নেই দেয় কে। লক্ষ্মী কিন্তু কোনোদিন কাউকে কিছু বলে না। যা আছে, যা পায়, তাই দিয়েই কাজ চালায় আর ভগবানকে ডাকে।

আজকে সুদাম কাঠের খোঁজে একেবারে গভীর জঙ্গলে গিয়ে পড়েছে। কালো ঝুল অন্ধকার, নিজের হাত-পাই যেন ভালো করে দেখা যায় না। বড়ো বড়ো বুড়ো গাছগুলোতে ঝুরি নেমেছে—আর সেগুলো একটার সঙ্গে আর একটা শেকলের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে ঘরের মতো তৈরী হয়েছে—তাই ফাঁক দিয়ে আলোর কণাও প্রবেশ করছে না। কোথায় কোন গাছে যে কুঠার বসাবে, সুদাম বুঝতেই পারছে না। আরো এগিয়ে গেলো। যতো এগোয়, ততো ঘন হয় অন্ধকার। কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো সুদামের। নাঃ, আর এগোনো ঠিক নয়—ভাবলো। কিন্তু কাঠ না সংগ্রহ হ'লে আজ তো উপোস দিতে হবে তাদের।

তাদের স্বামী-স্ত্রী হলেও বা কথা ছিলো। দেবু-দুর্গাকে তো লক্ষ্মী না খাইয়ে পাঠশালায় পাঠায়—তারা কি করবে ফিরে? যেমন করেই হোক্ তাকে কিছু কাঠ জোগাড় করতেই হবে। সমস্ত ভয় ভাবনাকে দূরে সরিয়ে সুদাম আরো অগ্রসর হলো! কেবলই অন্ধকার। জমাট অন্ধকার। অন্ধকারের যেন শেষ নেই। ভয়ে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। আরো কিছুদূর গিয়ে যেন মনে হলো অন্ধকার একটু কমে এসেছে, গাছগুলো আবছা দেখা যাচ্ছে। কোন ফাঁক দিয়ে আকাশের আলোও এসে পড়েছে। হ্যাঁ এবার ঠিক ঠাহর হচ্ছে, ভাবলো সুদাম। ভগবানকে স্মরণ করে বিরাট গাছটার গুঁড়িতে মারলো কুঠারের এক ঘা।

কিন্তু ঠং করে কিসে লাগলো। কাঠের গায়ে কোপ পড়েছে বলে তো মনে হয় না। আবার কুঠারের ঘা দিলো সুদাম। এবারও তাই—কাঠের গায়ে কোপই পড়ছে না। তিনবারের ঘা পড়তেই হঠাৎ চারিদিকে আলো হয়ে গেলো। আর সামনে এসে দাঁড়ালো অপূর্ব্ব সুন্দরী এক মেয়ে। ভয় পেয়ে কুঠার ছেড়ে সুদাম সরে দাঁড়ালো।

বনদেবী বললেন, "এই গভীর অরণ্যে তুমি কি জন্যে এসেছো ?"

ভয়ে ভয়ে সুদাম বললো, কাঠ কাটতে এসেছি। কাঠ না হ'লে—

—কিন্তু তার জন্যে এই গভীর জঙ্গলে আসবার কি দরকার ? কাঠ তো বনে ঢোকবার মুখেই পেতে। ঘটনায় এমন আশ্চর্য হয়ে গেছে সুদাম, যে মুখ দিয়ে কথা আর যোগাচ্ছে না। দু'বার ঢোক গিলে বললো, 'সামনের দিকে আর তেমন কাঠ পাই না মা, তাই এসেছি। তাছাড়া ঢুকেই দেখছি কেবলই অন্ধকার। কোথায় এসে পড়েছি তাও বুঝতে পাচ্ছি না।',

—'তুমি কি অনেক বেশী পাবে বলে এগিয়ে এসেছো ?'

—'না, বেশী চাই না ঠাকরুণ, কিন্তু প্রতিদিনের খাওয়ার মত পয়সা চাই তো, না হ'লে যে—'

—'হ্যাঁ বুঝেছি। বনদেবী হাসলেন, তারপর বললেন, সংস্থান হলেই চলবে ?'

ঘাড় নাড়লো সুদাম—হ্যাঁ। এই কাঠ বেচে পয়সা নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীকে দিলে তারপর সে ছেলেমেয়ে আর আমাদের একবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।'

—'একবেলা ! কেন !'

—'যা পাই তাতে একবেলাই হয়। আমাদের নিজেদের চেয়ে বাচ্চাদের জন্যই কষ্ট। আচ্ছা, আমি তাহ'লে বাইরের দিকেই যাই, কিছু কাঠ জোগার করে তাড়াতাড়ি ফিরি গিয়ে।'

—'আচ্ছা সুদাম, তুমি যদি অনেক টাকাকড়ি পাও তাহলে?'

সুদাম বললো, 'আমি গরীব কাঠুরিয়া, কাঠ কেটে বেচে খাই। আমি অতো, টাকাকড়ি কোথায় পাবো? তাছাড়া অততে আমার দরকারও নেই। পরিশ্রম করতে ভালোবাসি—তাই আমরা দু'বেলা দুটি খেতে পাই। আমার চেয়ে যারা অভাবী তারা চাইতে এ'লে নিজের থেকেও একটু যদি দিতে পারি, তাহলে আমরা খুশী। বিনা পরিশ্রমে কিছু চাই না মা। আমার পেটে খাবার শক্তি থাকে যেন, এই বরই দাও।'

—'তোমাকে আর কাঠ কাটতে হবে না সুদাম।'

—'সে কি কথা বলছো মা, বাচ্চাগুলো, বউ মরে যাবে যে না খেয়ে।'

—'এই দেখো। এই যেখানে তুমি কুঠারের ঘা দিয়েছো, এইখানে যা আছে তা সব নিয়ে যাও, আর দুঃখ থাকবে না।'

হঠাৎ চারিদিকে যেন হাজার হাজার আলো জ্বলে উঠলো, সব অন্ধকার কেটে শুধু আলো আর আলো। সুদাম দেখলো, বড়ো গাছটার নীচে সারি সারি মোহর আর টাকার ঘোড়া।

ভয় পেয়ে সুদাম বললো, 'আমার তো অত টাকার দরকার নেই মা, আমার দিন চলার মত হলেই হবে। এ সব

তোমার থাক, আমি কুঠার নিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে দেখি কাঠ পাই কিনা।'

—'সে কি কথা সুদাম. এসব তোমাকে নিতে বলছি নাও।'

—'না মা, ওসব বলো না, চললাম আমি।'

বনবেদী সুদামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বেশ আজ যাও, কাল এই সময় লক্ষ্মীকে নিয়ে এখানে এসো।'

সেদিন আর সুদামের কাঠ কাটা হলো না। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে ভয়ে ভয়ে সব বললো লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী সব শুনে অবাক। কিন্তু কাঠ পায়নি। পয়সা নেই—এক্ষুনি ছেলে-মেয়ে এসে পড়বে, এই ভেবে সে অস্থির হয়ে পড়লো। কি দেবে তাদের মুখে, স্বামীকেও তো অভুক্ত থাকতে হলে। লক্ষ্মীর চোখে জল এলো। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে লক্ষ্মী বললো, 'বেশ, কাল যাবো তোমার সঙ্গে, কিন্তু আজ কি হবে ?'

— ওগো দেবু-দুর্গার মা, বলি কোথায় গেলে গো ?'

আঙ্গিনায় এসে লক্ষ্মী দেখলো, তাকেই ডাকছে দু'জন অচেনা মেয়ে।

—'এই নাও, জমিদার বাড়ী পূজো হয়েছিল ; তোমাদের জন্য প্রসাদ পাঠিয়েছেন। আর এই সিধা বিলানো হয়েছে, তোমাদেরও রয়েছে।' লক্ষ্মী কিছু বলবার আগেই তারা চলে গেলো।

—'ওমা একী কাণ্ড ! সমস্ত আঙ্গিনা যে ভরে গেছে—এতো জিনিস একসঙ্গে তারা চোখেই দেখেনি। আবার কাপড়-চোপড় পর্যন্ত কিছু বাকি নেই। জমিদার বাবুদের তো চেনে না আর কখনো তাদের কাছ থেকে কিছু আসে

নি—আজই হঠাৎ এতো এলো। লক্ষ্মী ভাবলো, এতো দয়া এমন করে পাঠিয়েছেন সব, অনেক দিন বাদে ছেলে-মেয়েরা পেট ভরে খাবে—প্রতিবেশীকেও একটু দিতে পারবো। ভগবান যেন ওদের মঙ্গল করেন।

পরের দিন লক্ষ্মীকে সঙ্গে করে সুদাম সেই বনের সামনে গেলো। আগের মতই ঘন অন্ধকার। তাছাড়া গতকাল থেকে যা যা ঘটেছে, তা মনে হলেই যেন কেমন লাগে। কেনই বা জমিদারবাবু এতো পাঠাতে গেলেন। আমরা গরীব, আমরা তাঁর কিছু উপকারে আসতে পারবো না, কেবল নিয়েই যাবো? এতো বড় লজ্জার কথা।

ঠিক চিনে আসতে না পারলেও এক জায়গায় এসে সুদাম দাঁড়িয়ে পড়লো। এখানে বেশ অন্ধকার। কিন্তু দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে? কাকেই বা ডাকবে, কিছুই তো জিজ্ঞেসই করেনি। লক্ষ্মীরও কেমন ভয় ভয় করছে। হাতের কুঠারটা জোর দিয়ে নামিয়ে রাখতেই ঠুং করে শব্দ হলো আর অমনি সব অন্ধকার দূর হয়ে গেলো, হাজার বাতির রোশনাই-এর মতো আলোয় আলোয়।

বনদেবী বললেন, 'লক্ষ্মী এখানে যে এত ধনরত্ন, তোমাদেরও অভাবের অন্ত নেই, নাও না সব, আমি তো দিচ্ছি তোমাদের।'

লক্ষ্মী হাত জোড় করে প্রণাম করলো। বললো, 'আমরা বড়োই গরীব মা, আমাদের নিতে এসব বলো না। ও যেন খেটে খেতে পারে। ছেলেমেয়ে দুটোকে ভালো মানুষ করতে পারি, তেমনি আশীর্বাদ দাও না। অতো লোভ দেখিও না।'

বনদেবী হাসলেন ; 'এ রকম শুনিওনি দেখিওনি লক্ষ্মী। এই রকম কষ্ট করবে তবু ধনরত্ন নেবে না ?'

লক্ষ্মী বললো, পরিশ্রম করে নিতে দাও মা। এমনি নেবো কেন? তাছাড়া অতো কি হবে? আমরা যে গরীব।

—ঠিক বলেছো লক্ষ্মী, পরিশ্রমেই মানুষ সব জিনিসের মূল্য বোঝে। দয়ার দান কিম্বা অনায়াসে পাওয়া জিনিসের মূল্য বড়ো কম। আমি ভারি খুশি হয়েছি। আচ্ছা, কাল থেকে প্রতিদিনই সুদাম এই বনে এসে যেন কাঠ কেটে নিয়ে যায়—কোন দুঃখ থাকবে না। পরিশ্রম করেই মূল্য নিও। আর দেখো যদি কোনো দিন দুঃখ কষ্ট পাও তাহ'লে এই নদী দেখছো—

কথা শেষ হবার আগে লক্ষ্মী চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো নদী বা জলের চিহ্ন নেই, কেবল চারিদিকে মোটা মোটা ভারি গাছ তার লম্বা লম্বা ঝুরি নেমেছে মহাদেবের জটার মতো।

আবার তাকালো বনদেবীর দিকে। বনদেবী একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'গভীর আধারে যদি এতো আলো দেখতে পাও, তাহলে জলও পাবে। ঐ যে দেখো।'

—'ওমা তাই তো!' লক্ষ্মী অবাক হয়ে দেখলো কিছু দূরে রূপোর মত একফালি নদী বয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার জলে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ উঠছে।

—'কিছু বলবার থাকলে এখানে এসে বললে আমি শুনতে পাবো। কিন্তু যেদিন এই সৎ পথ থেকে সরে দাঁড়াবে সেদিন নদী, অরণ্য সবই ধু ধু মরুভূমি হয়ে যাবে।'

বনদেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আবার অন্ধকার হয়ে গেলো চারিদিক।

কাঠ বেচেই সুদাম বিরাট ধনী হয়ে গেলো। প্রতিদিন লোকজন নিয়ে বনের মধ্যে যায় আর অনেক কাঠ নিয়ে বেরোয়। এতো দামে ভালো কাঠ বিক্রী হয় যে, সে নিজেও অবাক হয়ে যায়।

ঘর বাড়ি টাকা কড়ি সবই হয়েছে তার। কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে উপার্জন করার কথা ভোলেনি। আর লক্ষ্মী। প্রতিমাসে একবার করে সুদামের সঙ্গে সেই বনের মধ্যে নদীর ধারে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে দেয় আর বলে, 'মাগো আমাদের কখনো পথভ্রষ্ট করো না।'



ডাকাতের হাতে

এ যুগের সঙ্গে তোমাদের কিছুটা পরিচয় আছেই—সে যুগের ডাকাতির গল্পের দু'-একটা ঘটনা আজ তোমাদের বলবো। তোমাদের অনেকের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, ডাকাতেরা কেবল মারধোর খুন জখম করে; হিংস্র হয়ে লুঠতরাজ করে; অকারণে মানুষকে হত্যা করে; সারা-জীবনের মতো জখম করে, আর ধরা পড়বার ভয় থাকলে খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

তাদের ঝাঁকড়া চুল, দীর্ঘাকৃতি চেহারা, কপালে মোটা ফেট্টি বাঁধা, চোখ মুখের আকার ভীষণ, মোটা করে টানা কালি বা ভূষোর দাগ—মাথায় কালী পূজার জবাফুল গোঁজা, হাতে মোটা বড় লাঠি, সময়ে সময়ে অস্ত্র শস্ত্র।

মোটামুটি ডাকাতরা এই রকমই হয়ে থাকে। রঘু ডাকাত, বিশে ডাকাত, ভীমে ডাকাত, চিতু ডাকাত এরকম কয়েকজন নামকরা ডাকাত—যাদের নামে সারা বাংলাদেশ

ভয়ে চমকে উঠতো, তাদের মনেও কিন্তু গরীবের প্রতি করুণা ছিলো। বড়ো হয়ে তোমরা ভবানী পাঠকের কথাও হয়তো পড়বে, দেখবে, এমন কয়েকজন ডাকাত দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করতেই ডাকাতি করতো বা অনেক অত্যাচার সয়ে ডাকাত হয়েছিলো।

গ্রামের জমিদার শিবশঙ্কর রায়ের যেমন ছিলো প্রতাপ, তেমনি ঐশ্বর্য। আরো পাঁচটা গ্রামের লোকে তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। পূজোর সময় গোটা গ্রামের লোক জমায়েৎ হতো এই জমিদার বাড়ীতে। শিবশঙ্করবাবুর ঢালা আদেশ ছিলো কেউ যেন অভুক্ত ফিরে না যায়।

জমিদারবাড় পাহারা দেবার জন্য ভালো ব্যবস্থাই ছিলো। বেশ কিছু পাহারাদার সব সময়ই পাহারায় মোতায়েন থাকতো।

সেদিন, তখন বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শিবশঙ্করবাবু বন্ধুদের সঙ্গে পাশা খেলছেন। পাহারাদাররা সাধারণ পোষাকে নিজেদের খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে উপস্থিত। রামসিং বড়ো পাহারাদার, সেই সকলকে দেখাশুনা করে, কখন ডিউটি হবে ভাগ করে দেয়। ভিক্ষুককে দেখে সে বললো, কাকে চাই, কি চাই তোর?

ভিক্ষুক একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে বললো, কিছু চাই না, একটু খেতে চাই। দু'দিন কিছু খাইনি, দাঁড়াতে পাচ্ছি না। দয়া করে একটু খেতে দাও বাবা।

রামসিং-এর মনে দয়া হলো, তাছাড়া জমিদারবাবুরও কড়া হুকুম আছে, কেউ যেন অভুক্ত ফিরে না যায় বাড়ী থেকে। কিন্তু তাদের খাওয়াদাওয়ার পাট তো সন্ধ্যের

মধ্যে শেষ হয়—কিছুই খাবার নেই। একটু ভেবে সে বললো, আচ্ছা আয় আমার সঙ্গে—বলে বাড়ির ভিতরে ঢুকলো। একেবারে রান্নাবাড়ির কাছে গিয়ে বললো, একে খেতে দাও গো মা, ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছে। রাঁধুনি তাড়াতাড়ি কলা-পাতায় মুড়ে কিছু খাবার দিলো ভিক্ষুকটিকে।

পাতায় করে রাঁধুনির দেওয়া খাবার হাতে পেয়ে, ভিক্ষুক রামসিং-এর সঙ্গে অন্দরমহল ছেড়ে একটু এসেই বসে পড়লো।

রামসিং বললে, কি হলো ? এখানে বসে পড়লি কেন ?

—যাচ্ছি বাবা, এক্ষুনি চলে যাবো, আগে একটু খাই, না খেলে আর নড়তে পাচ্ছি না—এই বলে সে বসে পড়ে খেতে আরম্ভ করলো।

রামসিং ভাবলো, আহা দু'দিন খায়নি, তাই সহ্য করতে পাচ্ছে না।

আমি ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি। খেয়ে শীগ্‌গির চলে আসবি।

—হ্যাঁ যাচ্ছি, বাবা যাচ্ছি—চলো।

রামসিং দৃষ্টির অন্তরাল হতেই ভিক্ষুক খাবার পাতায় মুড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, পায়ে পায়ে ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। তার ভাগ্য ভালো, যে ঘরটায় সে ঢুকলো সেটা কেবল কাঠ বোঝাই রয়েছে। কাঠের পিছন দিকে গিয়ে দিব্যি করে ঠেস দিয়ে বসে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লো।

রাত বেশ গভীর হয়েছে। রামসিংদের দলের খটখট জুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বাড়ির চারপাশে। এমন সময় একদল ডাকাত হাতে লাঠি সোটা নিয়ে সোরগোল করে

জমিদার বাড়ির কাছে এলো। তাদের রক্তবর্ণ চোখ ভাঁটার মতো ঘুরছে, মাথায় কাপড় বাঁধা, কপালে লাল চন্দনের প্রলেপ।

তারা আসবামাত্র রামসিং-এর দল 'কৌন হ্যায়' করে এগিয়ে গেলো। এর মধ্যে খটাস করে বাড়ির সদর ও খিড়কি দরজা খুলে গেলো। রামসিং-এর দলকে হটিয়ে ডাকাতেরা হৈ হৈ করে অন্দর মহলে ঢুকে পড়লো।

রামসিং আহত অবস্থায় বাধা দিতে এলে, ওদের একজন তার গলা টিপে ধরলো। সামনা সামনি হওয়াতে রামসিং দেখলো সেই ভিক্ষুক! রামসিং-এর বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তখনই ভিক্ষুক বলে উঠলো, কি দেখছিস? তোর খাবার তোকে খাওয়াবো চল। এই বলে তার গলায় একটা কাপড় দিয়ে টানতে টানতে সেই কাঠ গুদামে নিয়ে গিয়ে বললো, দয়া দেখিয়েছিলি—এই নে তোর খাবার তুই খা! একথা বলেই পাতা ও এঁটো কাঁটাগুলো তার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে বললো, একপা নড়বি তো তোর হাড় এক জায়গায় মাংস এক জায়গায় করবো। এই বলে কাপড় দিয়ে খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে রেখে সে দলের সঙ্গে লুট করতে গেলো।

হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ আর লুঠতরাজ চলছে। ভয়ে কেউ বাধা দিতে পারছে না, কেননা ডাকাতের সর্দার মস্ত ঝকঝকে খাঁড়া খুলে সামনেই দাঁড়িয়ে।

চেঁচিয়ে বলছে, বাড়ির মেয়েরা, সকলে যার যা অলঙ্কার আছে খুলে দিয়ে যাও, আমরা মেয়েদের স্পর্শ করি না, যদি না দাও, যে যেখানে ব্যাটাছেলে আছে সবাইকে শেষ করে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেবো।

বাড়ির মেয়েদের তো আর সাধারণ অলঙ্কার নয়, হীরা মুক্তা চুনী পান্নার পর্বতপ্রমাণ গহনা, সোনার গহনা সব তারা সর্দারের চাদরে ঢেলে দিয়ে গেলো।

দু' ঘণ্টা ধরে লুঠ করে, পুরুষদের সেপাইদের বেঁধে রেখে তারা তাণ্ডবলীলা করে যাবার সময় বলে গেলো, কাল পুলিশে খবর দিয়েছো কিম্বা আমাদের ধরতে চেষ্টা করেছো কি, জেনে রেখো একটি প্রাণীও জীবিত থাকবে না।

পরদিন সকালে সবাই দেখলো জমিদার বাড়িতে টাকা-কড়ি ধন রত্ন সর্বস্ব ডাকাতে নিয়ে গেছে। জমিদারবাবু ও সেপাইরা আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। এক রাতের মধ্যেই তাঁরা নিঃসম্বল হয়ে পড়লেন।

এছাড়া ছিলো নদীর বুকে ডাকাতি। পূজোর সময় শহর থেকে গ্রামে আসবার সময় সকলেই কতো জিনিসপত্র নিয়ে দেশে আসতেন। কে কতো টাকা আনছে, কার সঙ্গে কি আছে এসব জল ডাকাতদের নখদর্পণে ছিলো। নদীর বুকে নৌকো করে আসতে আসতে হঠাৎ কোথা থেকে তর তর করে অন্য নৌকো এসে একেবারে গায়ে লাগিয়ে থেমে যেতো আর তা থেকে টপ টপ করে লাফিয়ে এই নৌকোয় পড়তো ডাকাতের দল। তাদের প্রথম কথা, কি আছে, তা কথা না বলে দিয়ে দাও, টুঁ শব্দ করেছো কি খুন করে নদীর জলে ফেলে দেবো। প্রাণের ভয়ে সবই দিয়ে দিতে হতো তবুও অনেক সময় নিস্তার পাওয়া যেতো না। যে নৌকো ভাড়া করা হয়েছিলো—এক সময় দেখা যেতো তারাও ডাকাত, এবং দু'দলের মধ্যে যোগসাজস থাকার ফলে এইসব ঘটার অনেক সুবিধে হয়ে যায়।

অনেককে কপর্দক শূন্য হয়ে অজানা নদীর পাড়ে নামিয়ে দিয়ে নৌকো চলে গেছে। যদি অপর কোনো নৌকো দয়া করে পৌঁছে দিয়েছে তবেই দেশের মুখ দেখা সম্ভব হয়েছে। এমনি ছিলো তখন ডাকাতির ভয়।

বিশ্বনাথ বা বিশে ডাকাতের দল একবার ডাকাতিতে বেরিয়েছে। যে বাড়িতে তাদের লক্ষ্যস্থল, দলবল সেখানে আগেই চলে গেছে। লাঠি হাতে বিশে ডাকাত একাই চলেছে অন্ধকার পথ দিয়ে, অসীম শক্তি ধরে সে, কাজেই একা হলেও কাউকে সে পরোয়া করে না।

পথ দিয়ে আসতে আসতে একটা ছোটো আধভাঙা বাড়ির ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ পেয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। আবার পায়ে পায়ে ঢুকে গেলো ভেতরে। একটি রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে তার মা অঝোর ধারায় কাঁদছে। বিশে-ডাকাত বললো, কি হয়েছে কাঁদছো কেন?

অতো রাতে অপরিচিত একজনকে দেখেও ভয় না পেয়ে ছেলের মা বললো, দেখো বাবা, এই ছেলের অসুখ, পয়সার অভাবে ডাক্তার দেখাতে পাচ্ছি না, পথ্য দিতে পাচ্ছি না, ওর বাবা মারা গেছেন, আমার কেউ নেই। তুমি বাবা আমায় দয়া করো।—বলে পায়ের ওপর পড়ে মা কাঁদতে লাগলো।

একটুখানি চুপ করে থেকে বিশ্বনাথ বললো, আমায় তুমি বাবা বললে, মা? আচ্ছা একটুখানি সবুর করো।

যে বাড়িতে তাদের আজ লক্ষ্যস্থল, দ্রুতপায়ে সে বাড়িতে গিয়ে দেখে দলবল নিঃশব্দে সেখানে পৌঁছে গেছে। বিশ্বনাথ দরজা ভেঙে ফেলে বাড়ির মধ্যে সোর-গোল তুলে ঢুকলো। ডাকাত পড়েছে বুঝে, বাড়ির

সবাই তখন আতঙ্কে শিউরে উঠেছে—আজ আর রক্ষা নেই।

বিশ্বনাথ সোজা উপরে উঠে ডাক দিলো, এ বাড়ীর ডাক্তার ছেলেটি শিগগির বেরিয়ে এসো।

কিন্তু কেউ আসে না দেখে রেগে চিৎকার করে বলে উঠলো, যে ডাক্তার সে যদি এখনি না বেরিয়ে আসে তাহলে এই বাড়ীর বাকি মানুষের কোন চিহ্ন রাখবো না।

ডাক্তার ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এলো।

বিশ্বনাথ আদেশের সুরে বললো, এখুনি তৈরি হও, রোগী দেখতে যেতে হবে আমার সঙ্গে। যেখানে নিয়ে যাবো শুধু আমার সঙ্গে যাবে তাই নয়, সেই রোগীকে একেবারে সুস্থ করে তুলতে হবে। যদি তা না করো তাহলে বলেই দিয়েছি কি করবো আর যদি মন দিয়ে চিকিৎসা করো তাহলে এ বাড়ির কোনো ক্ষতি হবে না। তারপর দলকে আদেশ দিয়ে বললো, তোমরা সব ফিরে যাও, এ বাড়িতে আজ আর কিছু হবে না।

দলবল নিঃশব্দে ফিরে গেলো আর বিশ্বনাথ ডাক্তারকে নিয়ে সেই রোগীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো।

বিশ্বনাথ বললো, তোমায় শেষ কথা বলে দিলাম ডাক্তার — এই ছেলেকে বাঁচাতে হবেই, যে ওষুধ, যে পথ্য লাগুক তা দিয়ে একে বাঁচানো চাই-ই। যদি না করো তাহলে কি হবে বলে দিয়েছি আর যদি যত্ন নিয়ে একে সারিয়ে তোলো, তাহলে তোমার ফিরে বহুগুণ তো তুমি পাবেই, তাছাড়া বিশু-ডাকাতের আমলে তোমার বাড়িতে কোনো দিন ডাকাতি হবে না।

তারপর ছেলের মাকে বললো, মা তোমার কিছু ভাবনা নেই, ছেলে তোমার ভালো হবেই, আমায় যখন বাবা বলেছো তখন তুমি আমার মেয়ে।

ডাক্তার ও বিশ্বনাথ দু'জনেই অভয় দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো। ছেলেটি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলো ডাক্তারের সুচিকিৎসায়।

বিশ্বনাথকে আর দেখা যায়নি কিন্তু যথাসময়ে ডাক্তারের পুরস্কার—মোহরের তোড়া এসে গিয়েছিলো—আর মাঝে মাঝে ছেলের মার কাছে টাকা সহ চিঠি আসতো।

মেয়ে! ছেলের জন্য কিচ্ছু ভেবো না. তাকে ভালো করে মানুষ করে তোলো। সর্বদা সৎপথে থেকো।

কৃতজ্ঞতায় ছেলের মা'র মন পূর্ণ হয়ে উঠলেও অনেক চেষ্টা করেও বিশ্বনাথের দেখা পায়নি—কিন্তু সময় মতো সাহায্যটি ঠিক পৌঁছে যেতো, কেমন করে আসতো সে সন্ধানও পাওয়া যায়নি।

নৌকো ডাকাতিতে একবার একটি ছোটো মেয়ে কেমন করে রঘু ডাকাতের নৌকোয় চলে এসেছিলো। মা-বাবার জন্য খুব কাঁদছিলো, কেউ বললো, মেরে ফেলে দাও নদীতে কেউ বললো, মা কালীর ওখানে নিয়ে চলো। কেউ বললো, বিলিয়ে দাও।

রঘু সকলকে ধমকে বললো, খবরদার, ওর জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। ওর কথা আমি বুঝবো।

মেয়েটিও দু'হাতে রঘুকে আঁকড়ে ধরে আছে, কিছুতেই ছাড়বে না। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলে উঠেছে। রঘু

অনেক জিনিসপত্র দিয়ে তাকে ভোলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

হঠাৎ মেয়েটি রঘুর গলা জড়িয়ে ধরে বললো, কখন আমার মা'র কাছে নিয়ে যাবে কাকু ?

কাকু ! রঘু অভিভূত হয়ে বললো, চলো মা, যাচ্ছি।

ধরা পড়বার সমস্ত ভয় থাকা সত্ত্বেও রঘু মেয়েটিকে তার বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলো।

কাজেই বুঝতে পারছো, ডাকাত শুধু ডাকাতিই করে না, তাদেরও মহৎ অন্তঃকরণ আছে।

অনেক রাতের গল্প



আট বছরের জন্মদিনে পাওয়া নাচিয়ে পুতুলটা উপহার পেয়ে মিঠু মণ্টুমামার উপর ভারী খুশী হয়েছে। এই 'ভারত নাট্যম'-এর চমৎকার পোশাক পরা, হাওয়া লাগলে নাচের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়া পুতুলটার উপর তার এত দিনের লোভ ছিল। অত দাম তাই বলতে সাহস হতো না।

মণ্টুমামা ভগবান নাকি?

তার বন্ধু—অনুরাধা কত নাম করেছে নাচে—পুতুলটা যেন ঠিক অনুরাধা!

অনুরাধার ডাক পড়লো।

পাশের বাড়ী থেকে অনুরাধা এসে দেখে নতুন পুতুলটা খেলাঘরে টেবিলের ওপরে রাখা।

সেখানে নেই এমন পুতুল নেই। কাল নতুন পুতুলকে নাচ শেখাবে বলে অনুরাধা বাড়ী গেল, মিঠুও পড়তে

খেলাঘরে টেবিলের নিচে মিঠুর পুতুলের সংসার। গেল। পড়তে বসলেই চোখ জড়িয়ে আসে কেন? মা'র বকুনী আরম্ভ হবে, কাল ইস্কুলেও কপালে দুঃখ আছে। ভাবতে ভাবতে মিঠুর বড় বড় হাই উঠতে লাগলো। চোখের পাতা টেনে ধরে রাখা যাচ্ছে না। রাত নামলো ঘরে। একরাশ অন্ধকারে মিঠু তলিয়ে গেল।

কালো কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুলটা উঠে খরগোসের ঘাড়ের ওপর পা দিয়ে উঁচু হয়ে টেবিলে দাঁড় করানো নাচিয়ে পুতুলটার দিকে দেখতে লাগলো।

—আঃ কর কি কাফ্রিদাদা, ঘাড় গেল যে আমার নামো নামো! খরগোস চেঁচিয়ে উঠলো—

দাঁড়ানা একটুখানি—কী নাচুনে মেয়ে এসেছে দেখছি।

ধমকে উঠলো গিন্নিপুতুল—নাকের নথটা দুলে উঠলো: ওরে হতভাগা, খরগোসটা যে মরে গেল, শীগগীর নেমে পড় —ঐতো কত চেয়ার টেবিল আছে একটার ওঠো না। ধমক খেয়ে কাফ্রি এক লাফ দিতেই সামনে খাবারের টেবিলে যেসব কাঁচের বাসনপত্র ছিল ঝনঝন করে পড়ে গেল। সেই শব্দে সবাই ছুটে এলো। মেমপুতুল মিহি গলায় বলে উঠলোঃ What happened?

হাঁসগিন্নী পাখা দুটো ছড়িয়ে—হলদে ঠোঁট ফাঁক করে বললে: কি, কি, ব্যাপারটা কি?

ভালুক খুড়ো বললে: ক'টা ভাঙ্গলো? কে ভাঙ্গলো?

সারা খেলাঘরে হৈ চৈ হুলস্থূল কাণ্ড।

টেবিলের উপর থেকে ঘাড় দুলিয়ে নাচিয়ে পুতুল একবার

তাকিয়ে দেখলো খেলাঘরের দিকে তারপর ভুরু দু'টো কপালের উপর তুলে, সারা শরীর দুলিয়ে বললে : কি দেখছো কি? আমার মত তোমাদের খেলাঘরে কি একটাও সুন্দর নেই?

কাফ্রি অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর কথা শুনে তো হতভম্ব—বলে কি নাচুনে মেয়েটা?

ততক্ষণে খরগোস এগিয়ে এসেছে, লাল পঁতির চোখ দু'টো চিকচিক করছে—কিন্তু খুব স্মার্ট!

সেদিকে তাকিয়ে বললে : ওমা! কি যে বল, সুন্দর নেই? দেখবে? কই গো মেমদিদি এসোনা এদিকে?

নীল চোখে তখন ঘুম জড়ানো—তবু টেবিলের দিকে তাকিয়ে মেম বল্লে : গুড মর্নিং। প্রতি-উত্তর না দিয়ে নাচিয়ে পুতুল মেমপুতুলকে দেখতে লাগলো—তারপর বল্লে : তোমরা নাচতে জানো?

কাফ্রি এগিয়ে এসে সাদা দাঁতগুলো বার করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল খরগোস তাকে থামিয়ে বললে : নাচ? ওঃ অনেক দেখেছি। মিঠুর বন্ধু অনুরাধা কত সুন্দর সুন্দর নাচ জানে, এই খেলাঘরে এসে মিঠুকে দেখায়—আমরাও দেখি —অনুরাধাও আমাদের বন্ধু যে! মুখটা বাঁকিয়ে নাচিয়ে পুতুল বললে : ও অনুরাধা? কথা তো বলছি না, ও তো কাল আমাকেও শেখাতে এসেছিল, হুঁ। সেই আলো ঝলমল দোকান থেকে এই অন্ধকূপে নিয়ে এলো মিঠুর মণ্টুমামা! কিনতে কিনতে বলছে : মিঠু খুব খুশী হবে। আহা মিঠু খুশী হবে তো আমার বয়েই গেল। তাহলে তোমরা কেউ নাচ—

বাধা দিল কাফ্রি পুতুল—হ্যাঁ হ্যাঁ জানে বৈকি মেমদিদি

ইংরিজি নাচ জানে—সেটা বোধহয় তোমার ঐ ঘাড় দোলানোর চেয়ে ভালই হবে।

—কী বলছ আমার চেয়ে ভালো? রেগে উঠল নাচিয়ে পুতুল।

গিন্নি পুতুল এসে বললে: হ্যাঁগো নতুন মেয়ে, এখানে এসেছ যখন তখন আমাদের সঙ্গে তো তোমায় থাকতে হবে তাহলে কেন ঝগড়া করছো। এখানে নাচ গান বাজনা সবাই কিছু কিছু জানে—তুমি তো বাছা ঐ ভারত-নাট্যম ছাড়া কিছু জানো না, আমি তো তোমার নামই দিয়েছি ভারতী। তা যা জানো তা জানো, এখানে যখন এসেছ, ঝগড়াঝাঁটি না করে মিলে মিশে থাকো। আজ মিঠু টেবিলের উপর তুলে রেখেছে কিন্তু দু'চারদিন বাদে এখানেই নামিয়ে দেবে। কেন অমন করছো। এখন চায়ের টেবিলে এসে চা খাও। ঝগড়াঝাঁটি করতে নেই। ঐ দেখো বিদেশ থেকে মেমপুতুল এসে কী সুন্দর মিলে মিশে আছে।

—ওঃ, কিছু জানে না মেমপুতুল তাই! নীচের দিকে তাকিয়ে তোমাদের ঘর দেখে গা ঘিন ঘিন করছে, আমি বাপু নীচে নামতে পারবো না।

—তাহলে ওখানে শুকিয়ে মরো—নথ নাড়া দিয়ে গিন্নি পুতুল একথা বলে নিজের কাজে গেল। কাফ্রি চোখ পিট পিট করে বললে: হ্যাগা ভারতী, তুমি অমন ধারা কেন? সব কথায় ঝগড়া করো কেন গো?

—তুই কি বিচ্ছিরী দেখতে। যা যা কথা বলিস নি— চুলগুলো আঁচড়াতে পারিস না?

খরগোস তার সাদা কান দু'টো তুলে তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে বল্লে: কি বলছো—তুই?

তার চেয়ে বরং আমাদের কাছে নেমে এসো, চা খেতে খেতে তোমার দেশের গল্প শুনি—মেমপুতুল বললে।

হ্যাঁ হ্যাঁ শীগগীর এসো, আজ চায়ের সঙ্গে বোম্বাই টোষ্ট আর মিষ্টি বাদামভাজা—ইস্ কী সুন্দর খেতে—নেংটি ইঁদুর একথা বলে জিব দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিলে।

রাগে দাঁত চেপে টেবিলের উপর থেকে ভারতী বললেঃ অসভ্য!

—কে, কে অসভ্য? ও-সব কথা এ খেলাঘরে বলতে নেই বুঝেছ—? ভারতীকে লক্ষ্য করে কাফ্রি বলে উঠলো।

—বলতে নেই! কি অসভ্যের দল সব সকাল থেকে চেঁচামেচি আর খাবার কথা।

গিন্নিপুতুল আবার এলো, ভারতীর দিকে তাকিয়ে বললেঃ 'কি গো নতুন মেয়ে! নামবেও না, চা'ও খাবে না? কতক্ষণ অমন করে থাকবে?' ভারতী হাত দু'টো ঘুরিয়ে নাচের ভঙ্গী করছিল, মাঝখান থেকে এ-সব শুনে বলে উঠলোঃ 'যাঃ ডিসটার্ব করে দিলে।' তারপর আরো জোরে চেঁচিয়ে বললেঃ 'আমি যাবো না বলে দিয়েছি, বারে বারে বিরক্ত করতে হবে না।'

অবাক হয়ে গিয়ে গিন্নিপুতুল বললেঃ 'ওমা সেকি কথা!' তারপর চলে যেতে যেতে নীচু গলায় বললেঃ ঠ্যাকার দেখে বাঁচিনা।

চায়ের টেবিলে সব জানাজানি বলাবলি হয়ে গেল। ভালুক মেসো আর হাতী খুড়ো একসঙ্গে বলে উঠলোঃ ওকে ডাকাডাকির দরকার নেই, যেমন অহঙ্কারী মেয়ে তেমনি থাকুক একা একা। আমাদের খেলাঘরে যে একতা আছে তা নষ্ট হতে দিলে তো পারি না।

ক্ষিদে তেষ্টায় প্রাণ যাচ্ছে, কাপড় ছাড়তে না পেরে

ভালো শাড়ী ময়লা হয়ে গেল। কোনো ব্যবস্থা নেই, কি করে এমনভাবে থাকা যায় !

ভারতী দেখে তার কাপড় জামা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কী সর্বনাশা। আঁতকে উঠলো যে। ক্ষিদে তেষ্টা সহ্য করে ভারতীর চোখে জল এসে গেছে। অনেকক্ষণ ভেবে নাচে খেলাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো : গিন্নিপ তুল সকালের জন্যে হাতে খাবার নিয়ে চায়ের টেবিলের দিকে যাচ্ছে।

সব অহঙ্কার ত্যাগ করে ভারতী ডাকলো : এই যে শোনো !

গিন্নিপ তুল বললে : কাকে ডাকছ বাছা, আমায় ?

—হ্যাঁ, দেখ আমার কাপড় টুকরো হয়ে গেছে যেন কেমন করে, ব্যবস্থা করতে পারো ?

—ব্যবস্থা ? তা কি আর পারি না ? আমাদের এত বড় সংসার—তাছাড়া 'জয়েণ্ট ফ্যামিলি'—মানে বোঝ ? এটা অবিশ্যি ইংরিজি কথা, মেমদিদি আমায় শিখিয়েছে—যাকে বাংলায় বলে যৌথ-পরিবার।

ব্যবস্থা তো প্রথম দিনই করছিলাম—তুমি তো নিলে না, অমন ঝঙ্কার দিয়ে কি কথা বলতে আছে, সবাই কত রাগ করছিল।

ভারতী একটু দমে গেছে, নরম গলায় বললে : তা ঠিক, তবে কি জানো আমার গুরু নাচ শেখাবার সময় বলেছিলেন: নাচ ছাড়া আর কিছু মনে রাখবে না। তাইজন্যই তো আমার অত নাম। সেদিন যখন প্র্যাকটিস করছি—তুমি ডাকলে, আমার রাগ হয়ে গেল।

কিন্তু তারপরও তো দু'তিন দিন কেটে গেছে। আর গুরু তো একথা বলেননি, নাচ করবে বলে অন্যের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো ?

চুপ করে রইল ভারতী। ঝিমিয়ে পড়েছে ক'দিন না খেয়ে দেয়ে,—তারপর কাপড়-জামার কি হালই না হয়েছে। তাই বললেঃ যাহোক এখন ব্যবস্থা করো—না হলে তো পারি না আর।

—বেশ, তাহলে নেমে এসো! সোজা বাথরুমে চলে যাও সেখানে সব আছে, তারপর চায়ের টেবিলে এসো। খবারটা আমি সবাইকে আগে দিয়ে রাখছি।

ভারতী আস্তে আস্তে নেমে পড়লো টেবিল থেকে। কাপড়খানার আর কিছু নেই, নীচের অমন সুন্দর শাড়ী।

তারপর? তারপর খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে পরিচয় হলো। হাতী খুড়ো বলে দিয়েছিল পুরানো কথা যেন কেউ না তোলে, কারণ ভারতী যখন নিজে এসে কম্প্রোমাইজ করেছে (এটা অবিশ্যি মেমপুতুলের কথা) তখন আর কিছু বলা হবে না। খরগোস লেটুসপাতা চিবুতে চিবুতে লাল-পুতির চোখে—নেংটির সাদা ছোট ছোট দাঁতগুলির দিকে তাকাচ্ছিল। কাফ্রি-পুতুল গম্ভীর হয়ে চা খাচ্ছে আর বলছেঃ সব জানি, কিন্তু বলবো না।

হাতীখুড়ো সেদিকে তাকাতে গিন্নিপুতুল বললেঃ কুচোদের কথায় কান দিও না খুড়ো। এসো ভারতী, চা খাবার খাও, তোমার দেশের গল্প বলো শুনি।

মিঠু! সন্ধ্যাবেলাই তোমার এত ঘুম? বই খুলে আর ঘুমুচ্ছ?

মায়ের ডাক শুনে মিঠু চোখ খুললোঃ বুঝতে পারছিল না কি ব্যাপার!

মা রাগ করে বলেই চলেছেন। আর মিঠু অবাক হয়ে পুতুল সংসারের দিকে তাকিয়ে ভাবলো কী হলো এটা? ঝগড়া করা ভালো নয় তাহলে?